

বঙ্গ

কমলাবার্তা

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। ২০২৪

'লুঠের মাল ফেরত করাব'
বাংলায় এটাই মোদির গ্যারান্টি



৪২ ৩ ৪২

রামের নামে গুণ কেন মমতার?
.....

মমতার রাজ্যে ধুকছে কৃষক
.....

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভুল থেকে শিক্ষা
.....

স্বাধীনতা ত্রিবেণী কুম্ভ

বাংলায় মোদির টার্গেট

মার্চেই সিএএ বাংলায়!

মমতার মুখোশ খুলে দিয়েছে সন্দেহখালি
.....

অমৃতবর্ণনে অন্ধকারে বাংলা



কৃষ্ণনগরে বিজয় সংকল্প সভায় তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে তীব্র আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।



আরামবাগে বিজয় সংকল্প সভায়, আগামী নির্বাচনে সন্দেশখালির 'বদলা'-র ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী।



হুগলির আরামবাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেল, বন্দর, তেল পাইপলাইন, এলপিগি সরবরাহ এবং বর্জ্য জল পরিশোধনের মতো ৭,২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



কল্যাণী এইমসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৭৫৪ কোটি টাকা খরচ করে ৯৬০ শয্যার কল্যাণী এইমস হাসপাতাল গড়ে উঠেছে ১৭.৯.৮২ একর জমির ওপর।

বঙ্গ কমলবার্তা

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা | ২০২৪



৪২ এ ৪২ পশ্চিমবঙ্গকে টার্গেট দিয়ে গেলেন মোদি সৌভিক দত্ত	৪
সন্দেশখালি মমতার মুখোশ খুলে দিয়েছে সাহানা মুখোপাধ্যায়	৬
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, বাঙ্গালী হিন্দুর রক্ষাকবচ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
রামের নামে এগোচ্ছে ভারত, ভয় কেন মমতার? জয়ন্ত গুহ	১২
মুখোশধারী কৃষক আন্দোলন, এরা জ্যে ঝুঁকছে বাঙালি কৃষকরা অভিরূপ ঘোষ	১৪
সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-৩)	১৬
ছবিতে খবর	১৮
অমৃতকালে বিকশিত ভারত, অন্ধকারে মমতার বাংলা দিব্যেন্দু দালাল	২৪
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের তুল থেকে শিক্ষা সুভাষ বিশ্বাস	২৭
ত্রিবেণী কুম্ভ, সাধুসঙ্গে ভারত মাতার জয়গান পল্লব মণ্ডল ও জাতিস্মান সরকার	৩০
ফেক নিউজ	৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ

সম্পাদকমণ্ডলী:

অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র

সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

যেনারী-শক্তির বিপুল ভোট আপনাকে বারবার ক্ষমতার সিংহাসনে বসিয়েছে সেই তাঁদের মান-সম্মান সন্দেশখালিতে যখন ধুলোয় মিশে গেল তখন আপনি কি করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী? আপনার স্নেহধন্য শাহজাহানকে লুকিয়ে রেখে চোর-পুলিশ খেলা খেলছিলেন? কেন? ভয় লাগছে? কখনও কি বিহারের একদা মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদের কথা মনে পড়ছে? নিজের ছায়া দেখেও কি চমকে উঠছেন দিনেদুপুরে? সেজন্যেই কি 'দিদিনং ১'-এ গিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চেয়েছিলেন?

আপনার রাজত্বে সন্দেশখালির 'সাধারণ মেয়ে'-রা হাতে লাঠি তুলে নিলা অসুর বিনাশী মা দুর্গা হয়ে উঠল। আপনার পোষা গুণ্ডাদের বাঁটা নিয়ে তাড়া করল। আপনার দলদাস পুলিশের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল। সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখাতে সাংবাদিক গ্রেফতার করালেন, আদালতে খাপ্পড় খেয়ে সুড়সুড় করে ছেড়ে দিতে হল। আপনি কিসসু করতে পারলেন না, পারছেন না এবং আপনাকে কেউ আর ভয়ও পাচ্ছে না। পুলিশ দিয়ে আটকাতে চেয়েও আপনি পারলেন না ভারতীয় জনতা পার্টিকে দমাতে। তাঁরা সন্দেশখালিতে গিয়ে মুখোশ খুলে দিল আপনার। সব হজম করতে হচ্ছে আপনাকে বসে বসে। কিন্তু সন্দেশখালিতে আপনি যেতে পারেননি। ভয় লাগছে? অপমানের ভয়? মান-সম্মান হারানোর ভয়? ভোট হারানোর ভয়? মহিলা ভোট আর সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার ভয়? এখুনি এত ভয় পাবেন না। সময় আসছে। যখন বদলা নেবে বাংলা- ভোটের বাস্তবে। তখন ভয় ছাড়া কেউ আপনার পাশে থাকবেনা।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় সংকল্প যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদির প্রথম জনসভা আরামবাগে যে লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালে হেরেই গিয়েছিল তৃণমূলের প্রার্থী আফরিন আলি (অপরূপা পোদ্দার)। পরে তাঁর স্বামী মহম্মদ শাকির আলির হাতযশে জেতেন মাত্র ১,১৪২ ভোটের ব্যবধান। বাবা তারকেশ্বরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ভাষণ শুরু করে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ উঠতেই প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হুকুম, “সন্দেশখালিতে মা-বোনদের সঙ্গে যা হয়েছে তার বদলা নেবেন কি নেবেন না?” —উত্তরে আরামবাগের জনসভা যখন খরখর করে কাঁপছে, সন্দেশখালি সহ বাংলার মানুষের যখন চোয়াল শক্ত হচ্ছে, ঘেঁষায় যখন গা গুলিয়ে উঠছে মমতার স্নেহধন্য শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে — তখন কে যেন বুকের ভিতর বলে ওঠে, 'বদলা চাই'। ভোটের বাস্তবে।

আরামবাগ - কৃষ্ণনগর, উভয় জনসভাতেই নরেন্দ্র মোদি খুব পরিষ্কার বার্তা দিয়ে গেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত, অসভ্য তৃণমূল দল এবং তার মাথা মমতা ব্যানার্জিকে। বাংলায় তৃণমূলের লুণ্ঠের রাজ আর চলবে না। গরীব-মধ্যবিত্তের টাকা, সরকারি যোজনার টাকা, গরীবের জমি এবার ফেরত দিতে হবে তৃণমূলকে। আর ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন, মালদা থেকে সন্দেশখালি, বাংলার ঘরের মেয়েদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে মমতার গুন্ডাবাহিনী- তারও জবাব দিতে হবে তৃণমূলকে। সময় হয়েছে। সন্তা নাটকের দিন শেষ। এবার মমতার সীমাহীন অত্যাচারের জবাব চায় বাংলা। জবাব চায় দেশ।

জয় হিন্দ!



৪২ এ ৪২

পশ্চিমবঙ্গকে টার্গেট দিয়ে দিলেন মোদি

সৌভিক দত্ত

আরামবাগ আর কৃষ্ণনগরের সভায় মোদির গলায় উত্তেজনার লেশমাত্র ছিলনা কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় তিনি তৃণমূলের উদ্দেশ্যে যা বললেন তা ভয়ানক। কোথাও কোন ব্যক্তি আক্রমণ নেই কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় তাঁর দৃঢ় উচ্চারণ- 'সন্দেশখালির বদলা' এবং 'লুচের মাল ফেরাতেই হবে'। এ যেন প্রবল ঝড় ওঠার ঠিক আগের মুহূর্ত। ৩৫ নয়া বাংলা থেকে মোদি চান ৪২ এ ৪২।

স্বভাবতই মোদির দুই সভাতেই মানুষের উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ পথ বোধহয় দেখিয়ে দিচ্ছিল এই দুই সভাই। বিশেষত কৃষ্ণনগরের সভায় এত মানুষ এসে গিয়েছিল যে তা ছিলো স্থানীয় সংগঠনের ধারণারও বাইরে। ফলে বহু মানুষকে মাঠের বাইরে থেকেই ভাষণ শুনতে হয়েছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কয়েকবার ভাষণ থামিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে তারা যেন আর না এগিয়ে আসেন, যেখানে আছেন সেখান থেকেই ভাষণ শোনেন। বিগত বিধানসভা ভোটের পর কৃষ্ণনগরে যে ভয়াবহ নির্বাচন পরবর্তী হিংসা হয়েছিল বিজেপি সমর্থকদের উপরে, তার প্রত্যুত্তরই যেন সাধারণ মানুষ দিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদির সভায় এমন জনসমুদ্র হয়ে এসে।

তৃণমূলের বঞ্চনা তত্ত্বের কাউন্টারে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে হওয়া কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা। সদ্য হওয়া যথাক্রমে ৭

হাজার কোটি আর ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাসের কথাও সভাপ্রসঙ্গতে মানুষকে জানান মোদি। ২ দিনের বঙ্গ সফরে বাংলার উন্নয়নে মোদির ঘোষণা ২২ হাজার কোটির। এর পাশাপাশি, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে পরিমাণ সাড়া দেখিয়েছে তা সারা দেশকে উজ্জীবিত করেছে বলে জানান তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের একসময়কার প্রধান শিল্প পাটশিল্প নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়েও আক্ষেপ উঠে এসেছিল তাঁর গলায়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান ও বিগত শাসকদল এই সোনালী শিল্পকে নষ্ট করে দিয়েছে। অপরদিকে কেন্দ্র সরকার গম-চিনি ইত্যাদির প্যাকেট করতে প্লাস্টিকের বস্তুর বদলে চটের বস্তা বাধ্যতামূলক করেছে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

কেন্দ্রের কথা, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর কথা আর পশ্চিমবঙ্গে তা হতে না দেওয়ার চেষ্টা নিয়েও মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। পিএম

কিমান সম্মাননিধি, বেটি বাচাও বেটি পড়াও, উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনা বা হর ঘর জল প্রকল্প - সবকিছুতেই সারা দেশে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হলেও পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির কারণে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে না। কেন্দ্র সরকার সারা দেশে চার কোটিরও বেশী মানুষকে পাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছে, এই রাজ্যেও ৪৫ লক্ষ ঘরের জন্যে ৪২০০ কোটি টাকা দেওয়া আছে কিন্তু রাজ্য সরকার সেই সুযোগ রাজ্যবাসীকে পেতে দিচ্ছে না। বিগত ৪ বছরে সারা দেশে ১১ কোটির বেশী পরিবার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়িতে বসে পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছে কিন্তু সেই কাজও পশ্চিমবঙ্গে চলছে কচ্ছপের গতিতে।



কৃষ্ণনগরে মোদি বাড়।

একইভাবে ঝরিয়া - রাণীগঞ্জের কয়লাখনি বা ১৮০০০ কোটির জগদীশপুর - হলদিয়া - বোকারো - ধামড়া পাইপলাইন কিংবা তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর রেললাইন প্রকল্প; রাজ্য সরকারের সহায়তা না পেয়ে আটকে থাকা সমস্ত প্রকল্পগুলোর কথাই জানানো হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এমনকি যেটুকু কাজ হচ্ছে তাতেও রাজ্য সরকারের স্টিকার লাগছে। মহিলা হেল্পলাইন সারা দেশে পুরোদমে কাজ চালালেও এই রাজ্যে তা হচ্ছেনা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান যে মেডিকেল কলেজ শুরু হওয়া থেকে ২০১৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হয়েছিল। কিন্তু বিগত ১০ বছরে সেই সংখ্যা ২৬ এ পৌঁছে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। নদিয়ার এইমসের কথাও কৃষ্ণনগরে বলেন তিনি। ১০০০ বেডযুক্ত এই আধুনিক হাসপাতাল করার গ্যারান্টি দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তা পূর্ণ হয়েছে। "মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি" - এদিন মনে করিয়ে দেন নরেন্দ্র মোদি।

তার ভাষণে বাদ যায়নি রাজ্যে হওয়া সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কথাও। টিএমসি কথার অর্থ তিনি বলেন তু-ম্যায়-কোরাপশন হি কোরাপশন! তৃণমূল সরকার দুর্নীতির নতুন মডেল তৈরী করেছে বলে অভিযোগ করেন মোদি। রাজ্য সরকার অপরাধীদের আশ্রয় দিচ্ছে, বদলে দলীয় নেতারা টাকা পাচ্ছে তাদের থেকে। প্রাইমারিতে দুর্নীতি- পৌরসভার দুর্নীতি - সরকারি জিনিস কেনার দুর্নীতি - রেশন দুর্নীতি - জমি দখল - চিটফান্ড - গরু পাচার সহ তৃণমূল সরকারের যাবতীয় দুর্নীতি উঠে এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হচ্ছে রাশি রাশি কালো টাকা। তদন্ত করতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। অপরাধীদের বাঁচাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসছেন। আটকানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিদেরও। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে রাজ্যে অপরাধের জন্য

খোলা পারমিশন আছে কিন্তু এইমস সহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকার পারমিশন নিয়ে সমস্যা করে কারণ সেখানে তারা কমিশন পায় না। এখানে প্রথমে কমিশন আর তারপর পাওয়া যায় পারমিশন! তৃণমূলকে সরাসরি আক্রমণ করে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, টিএমসি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় নাম। টিএমসি মানে বিশ্বাসঘাতক - অত্যাচার! টিএমসি মানে ভ্রষ্টাচার - পরিবারবাদ। টিএমসি বাংলার লোকেদের গরিব বানিয়ে রাখতে চায়।

সদ্য ঘটে যাওয়া ন্যাঙ্কারজনক ঘটনা সন্দেহখালিও স্বাভাবিকভাবেই বাদ যায়নি মোদির ভাষণ থেকে। তিনি বলেন যে মা-মাটি-মানুষের ঢোল পেটানো টিএমসি সরকার সন্দেহখালির মহিলাদের সাথে যা করেছে তাতে সারা দেশ ক্রুদ্ধ! সাধারণ মানুষ সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকারের কাছে, কিন্তু তার বদলে রাজ্য সরকার অপরাধীদের আড়াল করেছে। বিজেপি নেতারা সাধারণ মানুষের হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, পুলিশের লাঠি খেয়েছে! স্থানীয় মানুষ ও বিজেপির চাপে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে অপরাধীকে গ্রেফতার করতে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন হল মূল অপরাধীকে এতদিন আড়াল করছিল কে? সন্দেহখালির যে মাতৃশক্তি লড়াই করে রাজ্য সরকারকে নত হতে বাধ্য করেছে তাঁদেরকে সম্মান জানান নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিমবঙ্গের ভোট-ব্যংক রাজনীতির দিকে নাম না করে ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন যে, কিছু মানুষের ভোট কি সন্দেহখালির মহিলাদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ? তিনি বলেন, ইণ্ডি জোটের নেতারা ভোটের স্বার্থে এই নিয়ে মমতাকে প্রশ্ন করার সাহস পায় না। এমনকি কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সন্দেহখালি নিয়ে বলেছেন, 'বাংলায় তো এসব চলতেই থাকে! পশ্চিমবঙ্গের জন্য এ এক নিদারুণ অপমান!



আরামবাগে মোদির সভায় নারীশক্তির উচ্ছ্বাস।

অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদে বলে যে morning shows the day! শুরু দেখেই বোঝা যায় বাকিটা কেমন যাবে। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আর সাধারণ মানুষ যেভাবে অভাবনীয় সমর্থন জানাচ্ছে - তাতে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল যেন এখানেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় মোদি সরকার যে গঠিত হবে তা তো আগামীকাল সূর্য ওঠার থেকেও বেশি সুনিশ্চিত! শুধু এটাই দেখার যে তৃণমূলকে নিয়ে সাধারণ মানুষের যাবতীয় ভয়-ভীতি-আতঙ্ক কাটিয়ে সেই বিজয়ে বাঙালির অংশগ্রহণ ঠিক কতটা থাকে। মোদি তো আমাদের টাগেট দিয়ে গেলেন ৪২ এ ৪২ করার! এখন দেখা যাক আমরা কতটা তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।



সন্দেশখালি

মমতার মুখোশ খুলে দিয়েছে

সাহানা মুখোপাধ্যায়

সন্দেশখালি আর সেই মমতা-ধন্য শেখ শাহজাহানের সন্দেশখালিতে নেই। সন্দেশখালি যেন এক আন্ত 'নন্দীগ্রাম' হয়ে উঠেছে। আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসছে প্রতি মুহূর্তে। চড়াম চড়াম করে ঢাক বাজাচ্ছে শাসকের নাকের ডগায়া মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর ভাইপোর যাওয়ার সাহস নেই সন্দেশখালিতে। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মমতা বুঝতে পারছেন, 'খেলা শেষ'। শুরু হয়েছিল নন্দীগ্রামে, শেষও হবে 'নন্দীগ্রামে'।

সন্দেশখালির তিন ত্রাসা শেখ শাহজাহান ওরফে 'বাঘ', শিবু হাজারা ও উত্তম সর্দারা সকলেই তৃণমূলের সম্পদ। এই তিন মূর্তির কারণে সন্দেশখালির মাতৃশক্তির মান-মর্যাদা-শরম আজ বে-আব্রু। এদের অত্যাচারে এলাকার মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হাড়হিম করা সে সন্ত্রাস। শাহজাহান আর তার দলের পাহাড় প্রমাণ অপরাধের অভিযোগ নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নীরবে সমস্ত জুলুম সহ্য করেছে সন্দেশখালির মেয়েরা। কোনও গণতান্ত্রিক দেশে এমনটা হয় কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর প্রশাসনের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে, বহু অপরাধমূলক কাজ করেও গ্রেফতার তো দূরের কথা, প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াবার স্পর্ধা পায় শাহজাহানের

বাহিনী। যার ফলে কেবল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় জন্ম হয়েছে এরকম হাজার হাজার সন্দেশখালি (এখনও পর্যন্ত সন্দেশখালি নামটিই প্রকাশ্যে এসেছে)। সরকারি মদতে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দিনের পর দিন তালিবানি কায়দায় মেয়েদের যৌনদাসী করে রাখার বিভৎস চেষ্টা চলছে। শাহজাহান ও তার শাগরেদরা বিভিন্ন ব্লকের দলীয় কার্যালয়গুলিকে একেকটি ধর্ষণ-খানায় পরিণত করেছে। যা পুলিশের নজর এড়িয়ে সম্ভব নয়। জানা গিয়েছে সমস্তটাই নাকি পুলিশের জ্ঞাতসারে ঘটে।

সংবাদমাধ্যমের সামনে সরাসরি মেয়েরা বলছে, 'বাইকে করে দিনেরবেলা ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যাবে শিবু হাজারার লোকেরা। কোন বাড়ির

হিন্দু মেয়ে-বউ দেখতে সুন্দর ও কম বয়সী। তাঁদের ফোন নম্বর নিয়ে যাবো তারপর রাতে তাঁদের ডেকে পাঠাবে বা তুলে নিয়ে যাবো এক দুদিনের জন্য নয়। যতদিন তাঁদের মন না পুরবে ততদিন মেয়েদের ওখানে রেখে দেবো 'তাগড়া চিকনাই' নারীর চাহিদা থাকত ওদের। সন্দেহশখালিতে এমন কুৎসিত তালিবানি যৌন নিগ্রহ লাগাতার ঘটে চলে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্ব। এই ধরনের অপরাধের স্বর্গরাজ্য সন্দেহশখালি।

পশ্চিমবঙ্গের ঘরের মেয়েরা আজ 'বাংলার ঘরের মেয়ে' মমতার পোষা গুন্ডাদের লালসার শিকার। যার জেরে সন্দেহশখালিতে ঘটেছে নারী-অভ্যুত্থান। জনরোষে জ্বলছে সেখানকার মাটি। তাঁদের রোষের কারণ যেমন শিবু-মস্তানরা, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসন এবং তৃণমূল দলা অথচ এই জন-ক্ষোভের আশুনা ঠান্ডা করবার জন্য ৫ জানুয়ারি নারী আন্দোলনের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সন্দেহশখালি গিয়ে বিক্ষুব্ধ মেয়েদের পাশে দাঁড়বার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ তিনি পুলিশমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবর্তে মেয়েদের প্রতিবাদের ঝড় ঠেকাতে বা সামলাতে পাঠিয়েছেন বিরাট পুলিশ বাহিনী, যাঁফা ১৫ দিন বাদে অবশ্য তিনজন মন্ত্রী গিয়েছিলেন সন্দেহশখালি পরিদর্শনো।

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূল জমানায় সন্দেহশখালিতে চলেছে তালিবানি শাসন। তালিবান সন্ত্রাসীরা শিশু, বধু, বিধবাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁদের যোদ্ধাদের যৌনদাসী 'স্ত্রী' হওয়ার জন্য ১২ বছরের কন্যাদের জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। ঠিক একই কায়দায় "রাত ১০টা বা রাত ১২টার পরে তৃণমূল দলের লোক বাড়ি থেকে জোর করে নিয়ে যায় শিবুর অফিসে। ভালো লাগলে রেখে দিত সেখানেই। 'ভয়ে ভয়ে এত বছর কাটিয়েছি। দিনরাত শুধু কাঁদতাম।' --- জানায় অত্যাচারিতরা। তারা আরও বলে, "শাহজাহান, শিবু হাজরা ও তার দল এলাকার মেয়েদের জোর করে নিয়ে যায় নিজেদের ডেরায় পাটি অফিসে মিটিংয়ের দোহাই দিয়ে। তারপর তাঁদের উপর চলে যৌন দাসত্ব। গর্ভবতী মায়েদেরও ছাড় নেই সেক্ষেত্রে।"

ভোট ব্যাংকের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা-কর্মীদের কাছে অত্যাচারিতের ক্রন্দন রোল পৌঁছায় না বা জেনে থাকলেও তাঁরা নীরব থেকেছেন এতদিন। কারণ, সর্বত্র চলেছে সংখ্যালঘু তোষণ। এই ভুক্তিকরণ এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে, এখন সেই তুষ্টি দুখেল গাভীদের দ্বারা সরকার বা প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তৃণমূল দলটাই পুরো আরাবুল, শাহজাহান, কাইজারদের মতো দুষ্কৃতীদের হাতে চলে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি গুন্ডা কন্ট্রোল করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাকে বলা যেতে পারে - morning shows the day. ক্ষমতায় এসেই মাঝরাত্তে কালীঘাট থানায় এসে আটক আসামীদের পুলিশি হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখনই রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝে গিয়েছিল যে, এ রাজ্যটা ভবিষ্যতে দাগি অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হবে। হয়েছেও তাই। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা উগরে দিয়ে সন্দেহশখালির মায়েরাও

বলছে, "উনি মহিলা? আবার মুখ্যমন্ত্রী? না উনি 'মূর্খমন্ত্রী'। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০/১০০০ টাকা দিয়ে উনি মেয়েদের ইজ্জত কিনছেন। শিবু হাজরা উত্তম সর্দারদের বলছেন মেয়েদের শ্রীলতাহানি করা। তার বিনিময়ে আমি ওদের টাকা দিচ্ছি।" চোখে ওদের আগুন বারো। আবারও বলে ওঠে, "উনিই নাকি আবার মা মাটি মানুষের নেত্রী? আমরা ওর সন্তানের মতো। কিন্তু মা হয়ে পাশে না দাঁড়িয়ে আমাদের উপর এই অত্যাচারে মদত দিচ্ছেন। শিবু হাজরাদের সাহস যোগাচ্ছেন গ্রেপ্তার না করে। আমরা টাকা চাই না। আমরা সম্মান চাই। ওঁর পোষা গুন্ডারা জমিজমা থেকে শুরু করে আমাদের ইজ্জতটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের জব কার্ডের টাকা চুকছে। শিবু হাজরার খাতায়া বিধবা ভাতার টাকা এলে ব্যাংক থেকে তুলে দিয়ে দিতে হচ্ছে শিবু হাজরার হাতো নদীর বাঁধ তৈরি করেছি, এক টাকাও মজুরি দেয়নি।"

দিনের পর দিন গ্রামের এই অসহায় মহিলারা মুখ বুজে হজম করেছে তৃণমূল-আশ্রিত নারী পাচারকারী মাফিয়া বাহিনীর জুলুমবাজি। বুকের ভিতর যন্ত্রণা পাথর চাপা দিয়ে তারা রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতাদের ফরমায়েসি মনোরঞ্জন করেছে। নিরুপায় হয়ে পুলিশের সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু রাজ্যটা



যে নির্লজ্জ এক মুখ্যমন্ত্রীর শাসনাধীনা যিনি কামদুনির মতো ভয়ঙ্কর পাশবিক গণধর্ষণকেও অনায়াসে দেগে দেন 'সাজানো ঘটনা' হিসেবে কিংবা অন্য দুষ্কৃতকারীর দুষ্কর্মকে লঘু করতে বলেন, "ওটা ছোট ছোট ছেলেদের দুষ্টুমি বা শরীর থাকলেই একটু-আধটু ধর্ষণ হবে।" তিনি শাহজাহান-শিবুর মতো পিশাচদের সমর্থন করে বিধানসভায় বলেছেন, "শাহজাহানকে টার্গেট করে ইডি ঢুকেছে। বহিরাগত মেয়েরা এলাকায় ঢুকে অশান্তি ছড়াচ্ছে। তাই মেয়েরা মুখে মাস্ক পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলছে। সন্দেহশখালি আরএসএস-এর বাসা।" এমন

নারকীয় নৈরাজ্যের পর দোষ স্বীকার ও সহমর্মিতা দূরে থাক বরং ধর্ষিতার জন্য সগর্বে রেট চাট ঘোষণা করেন এই পুলিশমন্ত্রীই। ফলত সরকারের প্রশ্নে কুকর্মে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে তৃণমূল-পোষিত মাফিয়ারাজ কায়ম হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতেই বাংলা জুড়ে শেখ শাহজাহানদের মুক্তাঞ্চল। মাথায় মমতাময়ী আশীর্বাদ না থাকলে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির গায়ে হাত তোলার সাহস কারও হয়!

ঘটনার সূত্রপাত ৫ জানুয়ারি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, শেখ আকুঞ্জিপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যায় তদন্তের স্বার্থে। কিন্তু শেখ শাহজাহানের প্রায় ৮০০-১০০০ গুন্ডাবাহিনী ও রোহিঙ্গাদের প্রমীলা বাহিনী এসে বাধা দেয় ও ইডি আধিকারকদের উপর চড়াও হয়ে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ করে। রেহাই পায়নি সংবাদমাধ্যমও। তারপর থেকে শাহজাহান এলাকা ছেড়ে গোপন ডেরায় ঢুকে যায়। অনেকে বলছিল সে নাকি দুর্নীতি ও চুরির সমস্ত নথি সমেত পালিয়ে গিয়েছে সুন্দরবনের কোনও ছোট্ট দ্বীপে। পুলিশ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না। আর 'ভাইপো' ভাষণ দিচ্ছিল আদালতের জন্য পুলিশ ধরতে পারছে না। শেষমেশ আদালতের কানমলা খেয়ে রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করলেও এলাকায় এখনও চলছে শাহজাহান

বাহিনীর হুমকি আপাতত রাজ্য পুলিশের হেফাজতে জামাই আদরে আছে শাহজাহান। 'ভাইপো' চুপ কিন্তু ভাইপোই শাহজাহানের পক্ষ নিয়ে ভরা জনসভায় সাফাই গেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেদিন তার বাড়িতে যায় তখন শাহজাহান বাড়িতেই ছিল না। তাহলে কীভাবে সে সেদিন আক্রমণ করতে পারে? স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অর্থাৎ পুলিশ তুমি খুঁজে পাবে না। লুকিয়ে রাখা পুলিশি পাহারায় তাই তিন মূর্তির হাজার অপরাধেও পুলিশ চোখ-কান-মুখ বন্ধ রেখেছিল?

সন্দেহখালি হিংসা, সন্ত্রাস, বেআইনিভাবে বলপূর্বক কৃষক ও আদিবাসীদের জমি দখলের অব্যাহত স্বর্গরাজ্য বানিয়ে রেখেছে শাহজাহান ও তার সাগরদেৱা। সেইসঙ্গে এলাকার মেয়েদের উপর তালিবানি কায়দায় অত্যাচার ইত্যাদি বহু অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসন বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপো কি জানতেন না, নাকি জেনেও নীরবে প্রশ্রয় দিয়েছেন এসব থেকে আমদানি লাভের গুড় খাওয়ার জন্য? কালীঘাট থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে এমন ন্যাকারজনক ভয়ংকর অপরাধ বছরের পর বছর সংগঠিত হয়েছে, পুলিশমন্ত্রী জানেন না এমনটা হয় না। আদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানতেন। তিনি ভেবেছেন শেখ শাহজাহান আর সংখ্যালঘুরা থাকলে তার লাভ। অন্যদিকে হিন্দু পরিবারগুলো বিজেপির দিকে চলে গেলেও তাঁর কিছু যাবে আসবে না। এত নারকীয় ঘটনার পরেও তিনি এই লজ্জাজনক ভাবনার বাইরে বেরতে পারছেন না। ভোট বড় বালাই। সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে তিনি এদের গায়ে শাস্তির আঁচড় লাগতে দেবেন না। অন্যদিকে, বসিরহাটের সাংসদ নুসরত জাহান কী করেছেন সন্দেহখালির মানুষের জন্য? নারকীয় ঘটনাগুলি সম্পর্কে তিনি কি কিছুই জানতেন না? গ্রামের মেয়েরা কেউ তাঁকে কোনওদিন দেখেনি। চেনেও না। কারণ, তাঁদের নিজের ভোট নিজে দেওয়ার অধিকার নেই। তাঁরা জানায়, তাঁদের হাত থেকে ভোটের কার্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তৃণমূলের গুন্ডারাই ভোট দিয়ে দেয়। নিরীহ এলাকাবাসী "তিন মূর্তি"র ভয়ে চুপ থাকত। আসলে মমতা ব্যানার্জি গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছেন। ওখানকার নিগৃহীত মহিলারা জানায়, "পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয় না। আসলে এই পুলিশেরই নাকের ডগায় শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠরা বেড়ে উঠেছে। রক্ষকই ভক্ষক সন্দেহখালিতে। এদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ নথিভুক্ত বা অন্যান্যের প্রতিকার চাইতে গেলে পুলিশ শেখ শাহজাহানের কাছেই ফিরে যেতে বলে।" তাতে অত্যাচারের মাত্রা আরও মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পাবে ভেবে নিজেদের গুটিয়ে নেয় সন্দেহখালির মেয়েরা। "মুখ্যমন্ত্রীও মহিলা। অথচ আমাদের মেয়েদের এভাবে অত্যাচার করছে।"--- বলছে এক আদিবাসী বৃদ্ধ।

যে মা-মাটি-মানুষের স্বপ্ন দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছেন, সেই মায়ের নারীত্ব, সম্মান আজ ভুলুগুটিত তাঁরই দলের নারী-লোলুপদের কামড়ে। মাটি আজ গরিবকে নিরাশ্রয় করে জমি হাঙরদের দখলে। নজরুলের ভাষায়, "...মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ/ মাটির মালিক তাঁহারা হন/ যে যত ভণ্ড খড়িবাজ, আজ সেই তত বলবান..."। অন্যদিকে বলবানের আগ্রাসনে মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাই স্কোভের আঙুনে জ্বলছে সন্দেহখালির মা-মাটি-মানুষের স্বরা।

গ্রেফতারের ভয়ে শেখ শাহজাহান এলাকা ছেড়ে বেরোতেই সহ্যের বাঁধ ভেঙে পথে নামে সন্দেহখালির শয়ে শয়ে মা-বোনেরা। বেতাজ বাদশা শাহজাহান, শিবু সর্দার ও উত্তম নঙ্গরের বিরুদ্ধে সন্দেহখালির মাটিতে আছড়ে পড়েছে তীব্র প্রতিবাদের ঝড়। বাতাসে মিশেছে 'আর নয় অন্যান্য'-এর কণ্ঠস্বর। আচমকা আক্রমণে আতঙ্কিত ও প্রতিবাদ প্রতিরোধের তাগিদে দিনের আলো ফুটতেই সংঘবদ্ধভাবে মেয়েরা যে যেমন পেরেছে লাটি, বাঁশ, বাঁটা, খুস্তি উঁচিয়ে পথে নেমেছে। বিদ্রোহের আঙুনে তা ছিল এক উত্তপ্ত মিছিল। শত পায়ের ধুলো উড়িয়ে থানা ঘেরাওয়ার ডাক দিয়েছিল আদিবাসী, তপশিলি মেয়েরা। চোখমুখে আঙুনের গোলা নিয়ে মেয়ের দল এগিয়ে গিয়েছে থানা অভিমুখে। নির্ভিক দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সন্দেহখালির এস পি'র দিকে চোখে চোখে রেখে স্কোভে ফেটে পড়ে পুলিশের বড়কর্তা হাসান মেহেদি রহমান যখন তাঁদের ফিরে যেতে অনুরোধ করেন, খোলাখুলি মেয়েরা জানায়, আজ আমরা একত্রে সোচ্চার হয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি বলে আমাদের সরে যেতে বলছেন? কোথায় ছিলেন আপনারা, যখন শাহজাহান, শিবু হাজার দল আমাদের রাত-বিরেতে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নিপীড়ন করত? আপনারা তো সেদিন এগিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করেননি? এই শাহজাহান-শিবুরাই নামমাত্র টাকার বিনিময়ে কিংবা কোনও দাম না দিয়ে বিঘার পর বিঘা আমাদের চাষের জমি দখল করে মাছের ভেড়ি ও পোল্ট্রি মুরগির ফার্ম তৈরি করেছে, আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে নিজেদের বাড়ি তৈরি করেছে, চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে ফসল নষ্ট করেছে....."। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এতদিন ধরে এত অত্যাচার হয়েছে, তখন কোথায় ছিল মমতাময়ী আর তাঁর ভাইপো?

প্রসঙ্গত জানাই গ্রামবাসীদের থেকে ২৫০ বিঘে জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে শিবু হাজারার বিরুদ্ধে। কোনও জমির জন্য লিজ বা চুক্তির বালাই নেই। তারই জেরে সাধারণ মানুষ শিবুর পোল্ট্রি ফার্মে আঙুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিশ দৌড়ছে মুর্গি পাকডাতো অথচ শাহজাহান ও শিবুর পিছনে দৌড়ে শিবুকে ধরত পারেনি। ১৬ তারিখ পর্যন্ত খুব পরিষ্কার কেন ওই এলাকায় বিজেপির ভোটের হার গত নির্বাচনে বেশি ছিল। যদিও বিজেপি করবার অপরাধে ওইসব এলাকায় তৃণমূলের নেতারা বিজেপির কোনও বাড়ি আস্ত রাখতে দেয় না, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। আসল কারণ হল জমি থেকে তাঁদের উৎখাত করে জমিগুলি নিজেদের দখলে নেওয়া। ফলত শাহজাহানের আতঙ্কে সপরিবারে গ্রামছাড়া বিজেপি কর্মীরা। মূলত কৃষক ও জনজাতিদের বসবাস সেখানে।

অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি রক্ষার বাহানায় সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের জন্য টাটার ন্যানো কারখানা বিদায় নিয়েছিল, সেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুগামীরা বিঘার পর বিঘা গরিবের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী? এখনও জমি মাফিয়াদেরই পক্ষে সাফাই গাইছেন। তাঁর পুলিশ রহস্যজনক কারণে শাহজাহানকে দীর্ঘ সময় ধরে গ্রেফতার না করলেও, সাংবাদিককে গ্রেফতার করে ভয় দেখাতে চায় সংবাদমাধ্যমকে বিরোধী দলকে সন্দেহখালিতে যেতে বাধা দেয় পুলিশ, একবার নয় বারবার। আবার মমতার সেই দলদাস পুলিশ, বাধ্য বালকের মত ঘুরে সন্দেহখালিতে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে যাওয়া তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে আসলে মুখোশ খুলে যাওয়ায়, ভয় পেয়েছে মমতা। জোট বেঁধেছে জনতা—এবার যাবে মমতা।



নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাঙ্গালী হিন্দুর রক্ষাকবচ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) পাশ করিয়ে বিজেপি সরকার একদিকে যেমন বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙ্গালী হিন্দু শরণার্থীদের জন্য একটা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করলো- সেরকমই তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দিয়ে বংশপরম্পরায় এদেশে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার একটা সুযোগও করে দিলা

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। মুসলিম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্ব তুলে ধরেছিল- এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি এবং তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কখনো সম্ভব নয়। অধিকাংশ মুসলিমের দাবীর ভিত্তিতে ১৯৪৭-এর ১৪ অগাস্ট মুসলিমদের জন্য পৃথক দেশ পাকিস্তান গঠিত হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ দাবী তোলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পূর্ণ জনবিনিময় করা হোক। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম পাকিস্তানে চলে যাক এবং হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যারা পাকিস্তানে রয়েছে তারা ভারতে চলে আসুক। এই বাস্তববোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার। বুঝেছিলেন যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুর নিরাপদে বসবাস করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু 'পণ্ডিত' জওহরলাল নেহরু এতে বাধা দেন। ফলে স্বাধীনতার আগে যে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২২% ছিল অমুসলিম (হিন্দু, শিখ প্রভৃতি), বর্তমানে তা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে মাত্র

৩%। আর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এ দেশভাগের আগের ২৮% হিন্দু এখন এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮%-এ। একটি হিসাব অনুযায়ী আর ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবো। অন্যদিকে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ৯% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫%। আর পশ্চিমবঙ্গেও ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭%-এ, যা ১৯৪৭-এর আগে ছিল মাত্র ১৯%। বর্তমানে ২০২৪-তে এসে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০% এরও বেশি। মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর- এই তিন জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বীরভূম, নদিয়া প্রভৃতি জেলার বহু ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে প্রায় দেড় কোটি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সত্ত্বেও কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ মুসলিম সংখ্যাগুরু একটি রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে? – এর উত্তর হল বাংলাদেশ থেকে ভয়ংকর পরিমাণে মুসলিম অনুপ্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ			মুর্শিদাবাদ			মালদা		
	হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান
১৯৫১	৭৮.৪৫%	১৯.৮৫%	১৯৫১	৪৪.৬০%	৫৫.২৪%	১৯৫১	৬২.৯২%	৩৬.৯৭%
২০১১	৭০.৫৪%	২৭.০১%	২০১১	৩৩.২১%	৬৬.২৭%	২০১১	৪৭.৯৯%	৫১.২৭%

উত্তর দিনাজপুর			বীরভূম			দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা		
	হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান
১৯৫১	৬৯.৩০%	২৯.৯৪%	১৯৫১	৭২.৬০%	২৬.৮৬%	১৯৫১	৭৩.৯০%	২৫.৩৫%
২০১১	৪৯.৩১%	৪৯.৯২%	২০১১	৬২.২৯%	৩৭.০৬%	২০১১	৬৩.১৭%	৩৫.৫৭%

'শরণার্থী' ও 'অনুপ্রবেশকারী'-র পার্থক্য কি?

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু বিয়য়ক দপ্তর 'ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন অফ রিফিউজিস' (UNHCR) ১৯৪১ সালের জেনেভা কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের উরুগুয়ে প্রটোকল অনুসারে 'উদ্বাস্তু' বা 'শরণার্থী'-র সংজ্ঞাঃ

"যদি কোন দেশের কোন মানুষ জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্রীয়তা, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন বিশেষ দলের সদস্য হওয়ার জন্য নিজের দেশে অত্যাচারিত হন এবং গভীর ভয়ের জন্য নিজের দেশে ফিরতে না চান, তবে ঐ মানুষটি দ্বিতীয় বা আশ্রয়দাতা দেশে শরণার্থী হিসাবে গণ্য হবেন"।

ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই যে সমস্ত হিন্দু শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হয়েছেন তারা শরণার্থী। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত মুসলিম বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষে এসেছে তারা 'অনুপ্রবেশকারী'। এই বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হয়। কিছুদিন আগে বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের কাজ। এছাড়াও এরা আফিম চাষ, জাল নোটের কারবার, চোরাচালান, নারী পাচার, ডাকাতি, ধর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা Citizenship Amendment Act (CAA) কী ও তা কেন প্রয়োজন?

ভারতীয় আইন অনুযায়ী, ১৯৭১-এর ২৪-এ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে আর কোন হিন্দু ভারতবর্ষে আসবে না- যদি আসে তবে সেটা বেআইনী অনুপ্রবেশ হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা বংশধরসহ প্রায় দু'কোটি মানুষ বর্তমানে ভারতবর্ষে (মূলত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে) বাস করছেন। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক মানুষই ভারতবর্ষে এসেছেন ১৯৭১-এর ২৪-এ মার্চের পর। যদিও তাঁরা ভোটার কার্ড, আধার কার্ড

করেছেন- কিন্তু আইন অনুযায়ী তারা ভারতবর্ষের অবৈধ নাগরিক। এঁদের আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে এতদিন কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসসহ কোন রাজনৈতিক দল কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৫-র ৭ই সেপ্টেম্বর পুরনো 'পাসপোর্ট আইন' ও 'বিদেশী আইন' সংশোধন করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দুদের নাগরিকত্ব লাভের পথটি প্রশস্ত হয়েছে। এরপর এই উদ্বাস্তু মানুষরা যাতে আইনত ভারতবর্ষের বৈধ নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে তাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৬ সালের ১৯-এ জুলাই ভারতীয় সংসদে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' বা 'Citizenship Amendment Bill' (CAB) পেশ করে। এই বিল অনুযায়ী- "২০১৪-র ৩১-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে বা ধর্মীয় অত্যাচারের ভয়ে যে সমস্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রীস্টান ও পার্সী সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন তারা সকলেই ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পাবে"। এর জন্য শুধু সেই মানুষটিকে টানা ৬ বছর ভারতবর্ষে থাকতে হবে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির বাধাদানের ফলে বিলটি 'যৌথ সংসদীয় কমিটি' বা 'জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি' (JPC)-তে পাঠান হয়। এরপর পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯-এর প্রথমদিকে বিলটিকে সংসদে পেশ করে। লোকসভায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে বিজেপি বিলটিকে পাশও করিয়ে নেয়। কিন্তু রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস প্রভৃতি দলের বিরোধিতার ফলে রাজ্যসভায় বিলটি আটকে যায়। ফলে এই বিলটি তখন আর আইনে পরিণত হতে পারে না। এই বিলটি তখন পাশ হলে সবথেকে লাভবান হত পূর্ববঙ্গ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে সব খুইয়ে ভারতবর্ষে আসা হিন্দু বাঙ্গালী। কিন্তু নিজেদের উদ্বাস্তু দরদী বলে দাবী করা তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের বাধ্য পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুরা নাগরিকত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আগে পাশ হয়ে গেলে অসমে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে হওয়া NRC তালিকা থেকে বাদ পড়া বাঙ্গালী হিন্দুরাও

এদেশের আইনত নাগরিক হয়ে যেতেন, ফলে তাঁদের আর কোন সমস্যায় পড়তে হত না। কিন্তু অসমে যারা বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্দশার জন্য কুমীরের কান্না কাঁদছে তারাই আবার রাজ্যসভায় বিজেপিকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করতে না দিয়ে উদ্বাস্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের পিঠে ছুরি মারছে। এই 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' বা 'CAB' (ক্যাব) -এর বিরোধিতা যেসব রাজনৈতিক দল করছিল ও করছে- বুঝতে হবে সে উদ্বাস্তু বাঙ্গালী হিন্দুর সবচেয়ে বড় শত্রু- এমনকি সে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের ও হিন্দু জাতিরও শত্রু।

২০১৯-এর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ৯ই ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আসে। বিরোধী দলগুলো পুনরায় দাবী করতে থাকে যে এই বিলে কেন পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদেরও রাখা হবে না। অর্থাৎ যাদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে দেশ ছাড়তে হল হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রীষ্টানদের পুনরায় তাদেরই আবার এদেশে নাগরিকত্ব দিয়ে পুনরায় ভারত ভাগ করে আরেকটা পাকিস্তান গঠনের পথ কেন প্রশস্ত করছে না সরকার? উত্তরে অমিত শাহ জানান যে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও

বাংলাদেশ- তিনটি দেশই ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ নয়- তাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাই সেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘুও নয়, আর অত্যাচারিত তোনয়ই। নিঃসন্দেহে এই বিল পাশ হলে সবথেকে বেশি লাভবান হত- বাঙ্গালী উদ্বাস্তু হিন্দুরা- যারা বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সবাইকে অবাধ করে, নিজ নিজ ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করার জন্য কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের বাঙ্গালী সাংসদরাও এই বিলের বিপক্ষে সংসদে সরব হলা এতে নেতৃত্ব দিলেন কে? বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের বহরমপুর থেকে নির্বাচিত সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী- যিনি কিনা নিজেই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিলের বিরোধিতায় সরব হলেন দমদম থেকে নির্বাচিত সাংসদ সৌগত রায়। সৌগতবাবুর পরিবার বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আসেন। আর উনি একটি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলের (দমদম) সাংসদ- তারপরেও ক্যাবের বিরোধিতা করা মানে উনি ওনার ভোটারদের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। যাই হোক অবশেষে ৩১-৮-০ ভোটে লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা ক্যাব পাশ হয়।

লোকসভায় বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে ক্যাব অনায়াসে পাশ করিয়ে নিলেও সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। ২০১৯-এর ১১ই ডিসেম্বর রাজ্যসভায় ক্যাব পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এখানেও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও'ব্রায়ান, সুখেন্দু শেখর রায় প্রমুখ ক্যাবের বিরোধিতা করেন। এই বিলের মাধ্যমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে আগত খ্রীষ্টানদেরও নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে- তাও একজন খ্রীষ্টান সমাজের প্রতিনিধি হয়েও ডেরেক নন্কারজনকভাবে ক্যাবের

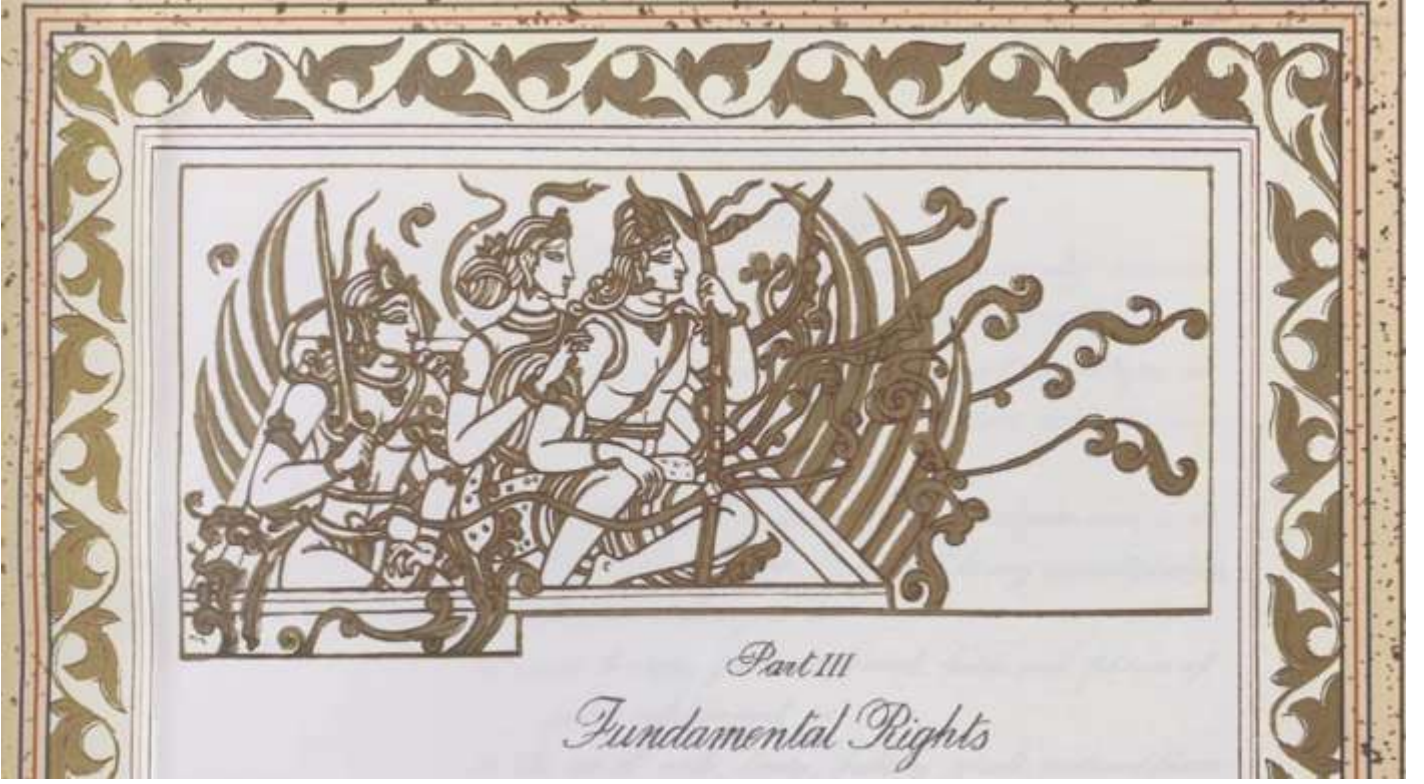


বিরোধিতা করেন। লোকসভা ও রাজ্যসভায় দু'জায়গাতেই নিজেদের উদ্বাস্তু-দরদী হিসাবে দাবী করা বামপন্থী সাংসদরাও বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার এই আইনের বিরোধিতা করেন। লোকসভার মতই রাজ্যসভাতেও তাঁর বক্তৃতাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘুদের ওপর বছরের পর বছর কিরকম অত্যাচার হয়েছে ধর্মীয় কারণে তা তথ্যসহ বলেন। বহু হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসে দিল্লী ও অন্যান্য শহরের বিভিন্ন বস্তি, কলোনী এলাকায় কিভাবে কষ্টের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে তাও জানান। রাজ্যসভায় শেষপর্যন্ত ১২৫-১০৫ ভোটে পাশ হয় ক্যাব। তারপর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরসহ এই বিলে আইনে পরিণত হয়। ফলে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা Citizenship Amendment Bill (CAB বা ক্যাব) পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা Citizenship Amendment Act (CAA বা ক্যা)-এ। পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) দ্বারা মূলত উপকৃত হবেন বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তু

সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি। এদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষে এসেছেন ১৯৭১-এর ২৪-এ মার্চের পর- ফলে আইনত এরা এতদিন ভারতবর্ষের নাগরিক ছিলেন না; এই আইনের ফলে হলেন। ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের আগে যারা ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাঁরা টানা ৬ বছর থাকলেই ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন এবং তিনি যবে থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন, তবে থেকেই নাগরিকত্ব পাবেন। এর জন্য বাংলাদেশে তাঁর

ওপর হওয়া ধর্মীয় অত্যাচারের কোন প্রমাণ দিতে হবে না। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, কোন উদ্বাস্তু বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের কাছে রেশন কার্ড থাক আর নাই থাক তাঁকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবেই। ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুদের কাছে তিনি যে হিন্দু- এই পরিচয়ই যথেষ্ট। এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়ে যাওয়ার ফলে অসমের বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরাও এ দেশের আইনত নাগরিক হয়ে গেলেন। কিন্তু অসমে যারা বাঙ্গালী হিন্দুদের নিয়ে রাজনীতি করছে তাঁরাই আবার লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিজেপিকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করতে বাধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের পিঠে ছুরি মারছে। কিন্তু যে যাই করুক না কেন, হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভয় পাওয়ার আর কোন জায়গা নেই। CAA-এর দ্বারা, সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরাও ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে এবং কোন কিছুর জন্যই তাঁদের আর কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

তাই একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন' (CAA) পাশ করিয়ে বিজেপি সরকার একদিকে যেমন বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙ্গালী হিন্দু শরণার্থীদের জন্য একটা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করলো- সেরকমই তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দিয়ে বংশপরম্পরায় এদেশে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার একটা সুযোগও করে দিল।



রামের নামে এগোচ্ছে ভারত, ভয় কেন মমতার?

জয়ন্ত গুহ

৭০ একর জমিতে ২১৭ মিলিয়ন ডলার, মানে ১৮০০ কোটি টাকার প্রকল্প-অযোধ্যায় রাম লালার মন্দির। দেশের সব শ্রেণীর মানুষের দান-এর টাকায় রাম লালার মন্দির নির্মাণ করে কি দেশের, দেশের মানুষ এবং অযোধ্যা শহরের কোন ক্ষতি হল? দেশের সম্মানহানি হল? অর্থনৈতিক উত্থানে কি পিছিয়ে গেল ভারত রাষ্ট্র?

২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়দানের পর শুরু হয় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ। আর ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে যখন রাম লালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন রেকর্ড তৈরি করে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের রেভিনিউ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ। শুধুমাত্র জানুয়ারি মাসের রেভিনিউ ৫,০০৫.০৬ কোটি টাকা। এর ফলে ১৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধির রেকর্ড তৈরি করে বর্তমান অর্থবর্ষে উত্তরপ্রদেশ সরকারের মোট রেভিনিউ (জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) দাঁড়াল ৩৬,১২২.৩৬ কোটি টাকা। কিন্তু মন্দির অর্থনীতি বলুন বা রাম লালার মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক সুফল, তা কি শুধু অযোধ্যা বা উত্তরপ্রদেশই পাবে? এনিয়ে সঠিক তথ্য আপনাকে জানতে হবে নাহলে আপনিও বাংলায় 'আনন্দপট্টি বা ঘনশক্তি'-র মত পিছিয়ে পড়বেন।

ইকনমিক রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "২০২৮ অর্থবর্ষে মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি ৫০০ বিলিয়ন ডলার

অতিক্রম করবে উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতি, যখন বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় স্থানে যাবে ভারত। ২০২৮ অর্থবর্ষে, দেশের অর্থনীতিতে ৫১৫ বিলিয়ন ডলারের কনট্রিবিউশন বা অবদান নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে উত্তরপ্রদেশ এবং ৬৪৭ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক অবদান নিয়ে প্রথম স্থানে থাকবে মহারাষ্ট্র। এবার নিশ্চয়ই পরিষ্কার হচ্ছে কেন রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল... এবার 'দেব' থেকে 'দেশ' এবং 'রাম' থেকে 'রাষ্ট্র' নির্মাণের পথ প্রশস্ত করতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে রূপান্তরিত করতে হবে বিকশিত ভারতে"।

রাম লালার ম্যাজিক বা ভারতের মন্দির অর্থনীতি - যাই বলুন না কেন, 'অযোধ্যার রাম মন্দির অর্থনীতিতে এক বিরাট প্রভাব তৈরি করতে পারে', আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং সংস্থা 'জেফেরিস'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশিত। ভাবা যায়, মোঘল রাজ এবং



রাম লালার জন্য নিবেদিত ৫৬ ভোগ প্রসাদ।

ব্রিটিশ রাজের সময় থেকে ক্রমাগত অবহেলায় চলে যাওয়া, একসময়ে উত্তরপ্রদেশে ফৈজাবাদ জেলার এক টিমটিমে শহর অযোধ্যা পথ দেখাচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ শুধুমাত্র অযোধ্যায় আসা পর্যটকদের কাছ থেকে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশী আয় করতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। রাম লালার দর্শন করতে বছরে আনুমানিক ৫০ মিলিয়ন ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা অযোধ্যায়, যা ছাপিয়ে যাবে গোল্ডেন টেম্পল (৩০-৩৫ মিলিয়ন) বা তিরুপতি মন্দিরে (২৫-৩০ মিলিয়ন) বার্ষিক দর্শনার্থীর সংখ্যা। ছাপিয়ে যাবে ভ্যাটিকান সিটি (৯ মিলিয়ন) এবং মক্কারও (২০ মিলিয়ন) বার্ষিক ভক্ত সমাগমকে। উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতি একাই ২০২৮ সালে ছাপিয়ে যেতে পারে নরওয়ে-র অর্থনীতিকে (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র রিপোর্ট)।

কলকাতা নয়, ভারতের নতুন 'কালচারাল ক্যাপিটাল' এখন রাম ও রামায়ণের অযোধ্যা। শুধু দেশ নয়, দেশের বাইরে অসংখ্য হিন্দু ভক্ত এবং ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকা-আফ্রিকার বহু মানুষ যারা রামায়ণ বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ভাবতে পারেন না, তাঁরা সবাই দিন গুনছে কবে আসবে অযোধ্যায়। এই বিপুল পরিমাণ পর্যটককে পরিষেবা দিতে খোলনলচে বদলে যাচ্ছে এক প্রাচীন শহরের, বিনিয়োগ হচ্ছে ৮৫,০০০ কোটি টাকা। এ যেন ভক্তির রাম আর যুক্তির রাম, মিলেমিশে রূপ দিচ্ছে এমন এক মন্দির অর্থনীতির যা থেকে উপকৃত হবে রামায়ণের দেশ ভারতবর্ষ।

তবে ভক্তিতে রাম, যুক্তিতে রাম, বিরোধিতায় রাম, তর্কে-বিতর্কে রাম – যে রূপেই যার কাছে তিনি থাকুন না কেন, এই বাংলায় বা ভারতভূমিতে অন্তঃসলিলা প্রবাহের মত রক্তে রক্তে তিনি সদা বিরাজমান। ভারতবর্ষের অমর-আকবর-অ্যান্থনি বা ব্রাহ্মণ-শূদ্র নিয়ে তাঁর ভেদাভেদ নেই। রাম ভেদাভেদ নয়, যোগাযোগের সেতু। তাঁকে অনুধাবন করার পথ খুব সোজা। সেবার পথা প্রত্যাশাহীন সেবা

ধর্মা রাম রাজ্যের ভেদাভেদহীন সেবা, সহমত ও সমন্বয়ের ধর্মা সহজ কথায়, সেবা ভাবনায় সবার সঙ্গে সবার প্রয়াসে বিকশিত হয়ে ওঠার রাষ্ট্র চেতনাই, রাম রাজ্য। শুধু ভারত নয়, রাম রাজ্যের ন্যায়নীতিই পথ দেখাবে আগামী পৃথিবীকে। কিন্তু এত সহজে রাম নিয়ে সমাধানের পথ কি পাওয়া যাবে? এই বাংলায়? বাংলার রাজনীতিতে?

সীতারাম সীতারাম..... আরে বাবা আমি সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরির কথা বলছি। যে সীতারামের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক মমতা ব্যানার্জির কিন্তু রাম লালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতি নিয়ে দুজনেই প্রবল 'সেকুলার'। নরেন্দ্র মোদি বিরোধিতায় কখনো একই মঞ্চে কংগ্রেসকে মাঝে রেখে দুপাশে দুজনে বসতে আপত্তি নেই কিন্তু কংগ্রেসকে যখন কদর্য আক্রমণ করছেন মমতা, তখন কংগ্রেসের পিঠ চাপড়ে সিপিএম মমতাকে বলছে বিজেপির এজেন্ট। সীতারাম সীতারাম!

আরে বাবা আমি সিপিএম দলের সীতারামের কথা বলছি না। মুখ্যমন্ত্রী যে সীতারামের কথা বলেন হামেশাই, মানে সীতা মাতা এবং প্রভু শ্রীরামের কথা বলছি। কিন্তু 'সীতারাম' শব্দে আস্থা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি একটি গালাগালি। ৩০ মে ২০১৯, উঃ ২৪ পরগণায় অন রেকর্ড বলেছিলেন



রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত।

মুখ্যমন্ত্রী কনভয় থেকে নেমে জয় শ্রীরাম ধ্বনি যারা দিচ্ছিলেন, তেড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের দিকে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কেন? তাহলে কি তাঁর সীতারামের প্রতি শ্রদ্ধা সত্যি নয়? ২০১১-তে পরিবর্তনের ডাক দেওয়া মমতা কি চাননা এই বাংলায় দুর্নীতিগ্রস্থ 'ভূতের রাজ্য'-র পরিবর্তে রামরাজ্যের ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হোক? কেন তিনি রামের জয়ধ্বনিতে রেগে যান? দুষ্ট লোকেরা বলে মোহলমান ভোটব্যাঙ্ক কাছে টানতে কিন্তু আমার ঠাকুমা বলেছিলেন যে রামনামে নাকি সব ভূতেরই প্রবল ভয়।

কে ভূত, কে অদ্ভুত আমার জানা নেই। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায়, রামের শাসন বা রামরাজ্য ছিল ভারতীয় সংবিধানের অনুপ্রেরণার উৎস। ডঃ আম্বেদকর সহ সংবিধানের খসড়া কমিটির (স্যর সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ, ব্রিটিশ ভারতে আসামের প্রথম প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন) সদস্যদের সর্বসম্মতিতে ব্যবহার করা হয়েছিল হাতে আঁকা এক অপূর্ব ছবি। একই ফ্রেমে একসঙ্গে রামচন্দ্র-সীতা মাতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণা সংবিধানের মূল অনুলিপিতে, মৌলিক অধিকারের তৃতীয় খণ্ডে আছে সেই ছবি। এঁকেছিলেন এই বাংলারই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু (এ লেখা শুরু হয়েছে যে ছবি দিয়ে)। সংবিধানের পাতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা রাম-রামায়ণ এবং রাম রাজ্যের ধারণাকে কি অস্বীকার করতে পারেন মমতা ব্যানার্জি? তিনি ভারতীয়! তিনি বা তাঁর দল এবং বামপন্থীরা বাঙালীর মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে রাজা রামকে? চেষ্টা করেছিল মোঘলরা। পারেনি।



মুখোশধারী কৃষক আন্দোলন এরাজ্যে ধুকছে বাঙালি কৃষকরা

অভিরূপ ঘোষ

দিল্লি সীমান্তে যা চলছে তাকে কি কৃষক আন্দোলন বলা যায়? চার কোটির মার্সিডিস বা তিন কোটির বিএমডব্লিউ গাড়িতে চড়ে কারা আসছে 'আন্দোলন' করতে? প্রতিটা ট্রাক্টরে লাখ টাকার মিউজিক সিস্টেম আর ট্রলিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা এসি টেন্ট নিয়ে যারা 'আন্দোলন' করতে আসছে তাঁরা কি কৃষক না রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দালাল?

বাজধানীর সীমান্তবর্তী এলাকায় তথাকথিত 'কৃষক আন্দোলন'-এর আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশ অন ক্যামেরা বারবার বিবৃতি দিয়েছে যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী মোদির জনপ্রিয়তাকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা। তাই এরা বেছে বেছে বিজেপি সাংসদদের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি নেয়, ভোট এলেই অঙ্কুতুড়ে সব দাবি নিয়ে আন্দোলন নেমে পড়ে আর সংবিধানের রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও যত দাবি দাওয়া রাজ্যের পরিবর্তে কেন্দ্রের কাছে পেশ করতে আরম্ভ করে।

আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পাঞ্জাবে এখন কেন্দ্রবিরোধী আম আদমি পাটির সরকার। আর ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তপশিল অনুযায়ী কৃষি, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। কেবলমাত্র আন্তরাজ্য বিষয়ে আইন তৈরি বা বিশেষ সহায়তার অধিকার কেন্দ্রের আছে। অর্থাৎ যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি কথার বারবার উঠে আসছে তা দেওয়ার প্রাথমিক কর্তব্য পাঞ্জাবের আম আদমি পাটির সরকারের। তাছাড়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল কেন্দ্রের থেকে অনেকটা বেশি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

দিয়েই সরকারে এসেছে। সেক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বটা আরো অনেকটা বেড়ে যায়। খেয়াল করলে দেখা যাবে পাঞ্জাবের তথাকথিত চাষীরা নিজেদের রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি একবারও রাখেনি। তাদের যত আন্দোলন শুধুমাত্র কেন্দ্রের বিপক্ষে।

এদেশে কৃষকদের থেকে আর্থিক ক্ষেত্রে বহুগুণ ভালো অবস্থা মিডলম্যানদের। বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীরাই তিন কৃষি আইনের বিপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সামগ্রিক স্বার্থের কথা ভেবে সেবার তিনটি কৃষি আইনই বাতিল করে দেয় কেন্দ্র। মনে করা হয়েছিল এর ফলে কৃষক আন্দোলনের নামে দিল্লিকে অবরুদ্ধ করে রাখা তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির হাত শক্ত করার খেলা হয়তো বন্ধ হবে। কিন্তু এবারে এমন কিছু দাবি উঠে এসেছে যা পূরণ করা কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রথম দাবি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ভারতকে। মানে বাকি বিশ্বের সঙ্গে কোন রকম বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকবে না

দেশেরা এখন অধিকাংশ কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রেই ভারত নেট এক্সপোর্টার। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদন হয় বলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাকি কৃষিজ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে ভারত। এখন বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হলে দালালদের পকেট ভরবে ঠিকই, কিন্তু বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে চাষীদের অবস্থা হয়ে উঠবে দুর্বিসহ। বিশেষজ্ঞদের মত এরকম পরিস্থিতি হলে সবথেকে বেশি যে রাজ্যের চাষীদের ক্ষতি হবে তা হল পশ্চিমবঙ্গ। পাঞ্জাবে মূলত ধান, গম আর আলু বীজ উৎপাদন হয়। ধান ও গম সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে এমনিতেই কেনো আর পাঞ্জাবে উৎপাদিত আলু বীজ গোটা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়ে যায়। অন্যদিকে ধান ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ফসল বলতে খাবার আলু, বিভিন্ন প্রকারের সবজি, চা, দুগ্ধজাত সামগ্রী, ফল এবং মাছ। ধান ছাড়া এগুলির কোনোটাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আওতায় আসে না। পাশাপাশি এগুলোর দাম ব্যাপকভাবে নির্ভর করে রপ্তানির উপর। এখন রপ্তানি বন্ধ হলে অভ্যন্তরীণ বাজারে মাত্রাতিরিক্ত জোগানের ফলে উৎপাদিত ফসল নষ্টের সমূহ সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে বড় চাষিরা নিজেদের ফসল বাজারে বিক্রি করতে সমর্থ হলেও ছোট চাষীদের পক্ষে এই অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের ৭১.২৩ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৯৬% ছোট এবং মাঝারি চাষী। ভারত ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন থেকে বেরিয়ে এলে এদের পক্ষে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হয় উঠবে।

দ্বিতীয় দাবি গতবারের আন্দোলনের সময় দিল্লির লালকেল্লা হামলায় জড়িত অপরাধীদের উপর থেকে সমস্ত মামলা তুলে নেওয়া। তাদের অপরাধের বিচার আটকে বা ঘোষিত জঙ্গী সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মুক্তি চেয়ে স্বঘোষিত কৃষক নেতারা কী প্রমাণ করতে চাইছে সেটা দুর্বোধ্য বিষয়। এসবের মাঝে সবথেকে জোরালো দাবি বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (অবশ্যই আন্দোলনকারী তথাকথিত কৃষকদের ব্যাপারে ভারত সরকারের থেকে পাঞ্জাব সরকারের দায়বদ্ধতা এ ব্যাপারে অনেকটা বেশি থাকা উচিত)। নিয়ম অনুযায়ী ২৩-২৪ রকম ফসলের জন্য কেন্দ্র প্রতিবছর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে। তার মধ্যে ধান ও গম অন্যতম। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্র একটা নির্দিষ্ট মূল্যে ধান ও গম কিনে তা রেশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় বন্টন করে (যদিও নির্লজ্জভাবে রাজ্য সরকার এই বিনা পয়সার চাল ও গমের কৃতিত্ব প্রচার করে)। নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্র ঘোষিত এমএসপি থেকে বেশি দামে রাজ্য সরকারকে ফসল কিনতে হয় (যেহেতু পরিবহন খরচ তথা সংরক্ষণ খরচ রাজ্যের ক্ষেত্রে কম)। বিভিন্ন রাজ্য যেমন মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট বা হরিয়ানার মত মুষ্টিমেয় রাজ্য বাদে আর কেউই সে পথে হাঁটে না। যদিও কেন্দ্র ঘোষিত এমএসপিই গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতে বেশি। যেখানে আর্জেন্টিনায় কুইন্টাল প্রতি গমের দাম ১১৯৪ টাকা, রাশিয়ায়

১৮৬৯ টাকা আর আমেরিকায় গড়ে ১৮০৯ টাকা (এই তিন দেশে গমের উৎপাদন বেশী) সেখানে ভারতে কেন্দ্র ঘোষিত গমের এমএসপি ২২৭৫ টাকা। প্রতি বছর মুদ্রাস্ফীতি অনুযায়ী এই ন্যূনতম ক্রয়মূল্য বাড়তে থাকে কেন্দ্র। আবারও ধানের ক্ষেত্রেও এই মূল্য আন্তর্জাতিক স্তরের থেকে বেশি এবং বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্য বাদ দিয়ে আর কেউ কেন্দ্রের ঘোষণার বাইরে এক টাকাও অতিরিক্ত এমএসপি ধার্য করে নি কৃষকদের জন্য।

গত বছর ১৯ জুলাই প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এ রাজ্যে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২১৮৩ টাকা (কেন্দ্রের ঘোষিত মূল্যই)। খাতায়-কলমে এই দামে যথেষ্ট পরিমাণে ধান কেনা হয়েছে বলেও কেন্দ্রকে জানিয়েছে রাজ্য। কিন্তু প্রকৃত চাষিরা কি ন্যূনতম এই দাম পেয়েছে! অভিযোগ, খুব বড় চাষিরা (পশ্চিমবঙ্গে যার সংখ্যা অনেকটাই কম) এই দাম পেলেও ছোট চাষিরা প্রায় কেউই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুবিধা এ রাজ্যে পায়নি। তাদের অধিকাংশই ধান বিক্রি করেছে গড়ে ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকা দামে। কিন্তু খাতায় কলমে ধান তো রাজ্য সরকার কিনেছে সে অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়াও হয়ে গেছে। তাহলে বাকি টাকা গেল কোথায়! কলকাতার কোন 'বিশেষ' পরিবারের কাছে? কলকাতার কোন 'বিশেষ' ঠিকানায়?

রেশন কাণ্ডে ধৃত মমতা ঘনিষ্ঠ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

এখানেই উঠে আসছে দালাল, কিছু অসাধু অফিসার এবং বিভিন্ন স্তরের

তৃণমূল নেতাদের এক অশুভ আঁতাতের গল্প। অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ব্যবস্থাকে এতটাই জটিল করে দিয়েছে যাতে সাধারণ চাষিরা কোনভাবেই নিজেদের উৎপাদিত ফসল নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে না পারে। ফলে তারা বাধ্য হয় কুইন্টাল প্রতি অন্তত ৫০০-৬০০ টাকা কম দামে সেই ধান বিক্রি করতে। এই ধান এরপর তৃণমূল নেতাদের মদতে দালাল মারফত পৌঁছে যায় কিষান মান্ডি বা কৃষক বাজারে। তারপর খাতায়-কলমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা তার বেশি দাম দিয়ে দালাল এবং নেতাদের থেকে সেই ধান সংগ্রহ করে সরকার। গত বছর এমএসপি ২০৪০ থেকে বেড়ে ২১৮৩ হলেও প্রকৃত চাষীদের বিক্রয় মূল্য কিন্তু বিশেষ বাড়েনি। যেটা বেড়েছে তা দালাল এবং নেতাদের অনৈতিক লাভ। অর্থাৎ চাষিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাবে আর লাভের গুড় খেয়ে যাবে ফরে তথা নেতারা - এটাই রাজ্যের অলিখিত নিয়ম। মোদ্দা কথা হল ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়লেও এ রাজ্যে সে টাকা চাষীদের পকেটে যাবে না। সবটুকু ছিনিয়ে নেবে তৃণমূলের বরপুত্র তোলাবাজ আর ডাকাতদের দল। কৃষকদের আর্থিকভাবে দুর্বল রেখে তাঁদেরকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করবে বলেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা বাংলার চাষীদের নিতে দেয়নি। তাই শেষ দশ বছরে যেখানে গোটা দেশে চাষীদের গড় আয় দুই থেকে তিন গুণ হয়েছে, সেখানে এ রাজ্যে কৃষকদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি তৃণমূল সরকার হতে দেয়নি।



শীতক রানির অবিচারে, নারী নির্যাতন রাজ্য জুড়ে



ছবিতে খবর

সম্মেলনস্থলে মাতৃশক্তি ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।





শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারের দাবীতে সন্দেশখালি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপি নেতৃত্ব।



সন্দেশখালিতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে, বসিরহাট সংশোধনাগারে বেআইনিভাবে আটকে রাখা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য সভাপতিকে দেখা করার অনুমতি দিল না মমতার দলদাস পুলিশ।



হাওড়ার পাঁচলায় জুজুরসাহা এলাকায় তৃণমূলের জোর করে জমি দখলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্দয় আক্রমণের শিকার পাঁচলা বিজেপি আহ্বায়ক শ্রী প্রশান্ত দাসের সাথে হাসপাতালে দেখা করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।



সম্মেলনস্থলে ১৩শ মূলের গুণ্ডাবাহিনীর তত্ত্বাধীনে মহিলাদের উপর অজাচারের প্রতিবাদে বিজেপি মহিলা মোর্চার মোমবাতি মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মাননীয় ভন্থি শ্রীনিবাসন সহ রাজ্যের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।



সম্মেলনস্থলে যাওয়ার পথে মমতার দলদাস পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র।

পাঁচলা বিধানসভার বিজেপি কনভেনর প্রশান্ত দাসের উপর তৃণমূল দুষ্কৃতীদের আক্রমণের প্রতিবাদ মিছিলে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।



সম্মেলনস্থলে কাণ্ডের প্রতিবাদে বসিরহাটে বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও।

বেড়মজুর গ্রামে মমতা পুলিশের হাতে আক্রান্ত মহিলাদের পাশে রাজ্য বিজেপি নেত্রী ফাল্গুনী পাত্র।



রাজ্য ও জেলার লিগ্যাল সেলের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।



তৃণমূলের অপশাসন দূর করতে কংগ্রেস নেতা কৌস্তুভ বাগচী সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিজেপিতে যোগদান করলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে।



ভারতীয় জনতা পার্টি পদাধিকারীদের সাথে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী ও রাজ্য নেতৃত্ব।



সম্বেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে এবিভিপি দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশের পক্ষ থেকে “কলকাতা চলো” প্রতিবাদ মিছিল।



সম্বেশখালিতে শাহজাহান বাহিনীর সম্মুখ বন্ধ করতে কলকাতার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিজেপির ধর্না-অবস্থান কর্মসূচিতে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য নেতৃত্ব।



সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের
পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ



বারাসাত জেলায় এসপি অফিসে ঘেরাও বিক্ষোভ কর্মসূচি।



শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলায় ডিসিপি
অফিসের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান।



কামারপুকুর এসপি অফিসের সামনে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি।



নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার উদোগে
কৃষ্ণনগরে এস পি অফিস অভিযান।



কোচবিহার বিজেপির এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি।



হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলায় সিপি অফিস ঘেরাও অভিযান।



সন্দেশখালি জুড়ে তৃণমূলের তাড়বের প্রতিবাদে বর্ধমান জেলায় বিজেপি মহিলা মোর্চা ও যুব মোর্চার ধর্না-অবস্থান বিক্ষোভ।



বিজেপি বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় প্রধানমন্ত্রী মোদীজির সভার প্রস্তুতি বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার ২নং মণ্ডলের মহিলা মোর্চার দিদিদের নিয়ে কৃষ্ণনগরে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির জনসভার প্রস্তুতি বৈঠক।



দেগংগা ২ এবং দেগংগা ১নং মণ্ডলের গ্রাম চলো অভিযান।



বোলপুর লোকসভার লাভপুর বিধানসভা ৪নং মণ্ডলের মেহেরপুর গ্রামে, গ্রাম চলো অভিযানে সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সহ-সভাপতি অনুপ কুমার সাহা।



অযোধ্যা রামমন্দির দর্শনের জন্য সিউডি থেকে আস্থা স্পেশ্যাল ছেড়ে গেল। রামভক্তদের স্বাগত জানালেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।



অমৃতকালে বিকশিত ভারত

অন্ধকারে মমতার বাংলা

দিব্যেন্দু দালাল

“বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না!” – এটা শুধু তৃণমূলের হুঙ্কার নয়। গভীরভাবে অনুধাবন করেছে তৃণমূল। বাংলাতেও গুজরাত মডেল চালু হলে তাতে তো বাংলার উন্নয়ন হত এবং বিকশিত ভারতের অংশীদার হতে পারত কিন্তু তাতে কি পকেট ভরত জ্যোতিপ্রিয়, পার্থ, শাহজাহান বা অনুব্রতদের? বাংলার দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার অমৃতকালে দাঁড়িয়ে, দিশাহীন মমতা সরকারের জন্য বাংলা বিকশিত ভারতের অংশীদার হয়ে উঠতে পারল না।

গত এক দশকের নিরন্তর প্রয়াস আজ ভারতকে বিকশিত দেশ গঠনের দোরগোড়ায় এনে দিয়েছে। ২০১৪ সালের পরিবর্তনের আগের ভারতের কথা একবার মনে করলে মানসপটে ভেসে উঠবে এমন এক ভারত যা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতির করাল গ্রাস ভারতের অর্থনীতিকে গিলে ফেলেছিল অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চড়া হারে সুদ নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছিল। কেন্দ্র সরকারের দিশাহীনতায় হতাশ হয়ে মুকেশ আম্বানী বলেছিলেন 'Policy paralysis'!

এদিকে দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার অবস্থাও ছিল তথৈবাচ। মুম্বই হামলার মত ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের পরেও ভারতের অবস্থান ছিল দুর্বল। পাকিস্তানের ওপর প্রত্যাঘাতের পরিবর্তে সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়লো 'হিন্দু সন্ত্রাসের' এক কাল্পনিক তত্ত্ব খাড়া করতে। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত একের পর এক প্রকট হতে থাকল দুর্নীতির নতুন নতুন ঘটনা। টু জি স্পেকট্রাম থেকে শুরু করে কয়লা, হেলিকপ্টার, ন্যাশনাল হেরাল্ডের মত কেলেঙ্কারির ফলে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা যেমন সম্পূর্ণ ভাবে চলে যাচ্ছিল তেমনই

দেশের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য জনমানসে প্রবল হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনই এক সময়ে, অবশেষে ২০১৪ সালে ভারত বেছে নেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে।

সমস্যায় জর্জরিত বিপুল জনসংখ্যার এই দেশকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করতে যে মানসিক দৃঢ়তা ও প্রত্যয় দরকার তার অনন্য সাধারণ নিদর্শন তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদির সরকার। বিগত এক দশকে একের পর এক যে গঠনগত সংস্কার হয়েছে তা অভূতপূর্বা সংস্কার শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কার হয়েছে সকল স্তরে।

- ১. আর্থিক ক্ষেত্রে সবথেকে বড় যে সংস্কার গ্রহণ করা হল তা বিমুদ্রাকরণ বা **নোটবন্দী**। দেশের ক্রমবর্ধমান কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতির গোড়ায় কুঠারাঘাত করার জন্য অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ ছিল এটা। এই একটা পদক্ষেপ, জাল নোটের পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে, কাশ্মীরে পাথরবাজীকে শেষ করে, ডিজিটাল অর্থনীতির পথ তৈরী করে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।
- ২. প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি **অপ্রত্যক্ষ কর** ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে

মোদি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল জিএসটি বা পণ্য ও পরিষেবা করা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর গড়ে তোলার ফলে এটি স্বচ্ছ, সরল এবং কার্যকরী হয়েছে যা করদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে জিএসটি সংগ্রহও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই বৃদ্ধি পেয়েছে বেশীরভাগ রাজ্যের আয়। গত বছরের তুলনায় এই বছরের বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ এবং বেশীরভাগ রাজ্যগুলোর আয়ও বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ।

● **৩. অর্থনৈতিক সংস্কারে প্রযুক্তি**-কে মোদি সরকার যেভাবে কাজে লাগিয়েছে সেভাবে আগের কোন সরকার পারেনি। ইউপিআই-এর মাধ্যমে মানুষ এখন সাবলীল ভাবে নগদ লেনদেনের পরিবর্তে ডিজিটাল লেনদেন করছে এবং এর ফলে একদিকে যেমন দুর্নীতির সম্ভাবনা কমেছে অন্য দিকে তেমনই মানুষের সময়ও বাঁচছে। এই সবার নেপথ্যে রয়েছে 'ইণ্ডিয়া স্ট্যাক' নামক ডিজিটাল পরিকাঠামো যেখানে বিভিন্ন এপিআই এবং ডিজিটাল সর্বজনীন পণ্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক পরিষেবা প্রদান করা যায়। এই পরিকাঠামোর ওপর নির্ভর করে বেসরকারী উদ্ভাবনী পরিষেবা যেমন গুগল পে, ফোনপে ইত্যাদির মত জনপ্রিয় অ্যাপ আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লেনদেনের সহজতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সাধারণ মুদিখানা, সজি বিক্রোতা, ফল বিক্রোতা কে না ব্যবহার করছে এইসব ডিজিটাল পরিষেবা।

● **৪. ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার** (ডিবিটি) হল আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ যার ফলে সরকারী যোজনার টাকা উপকৃত মানুষের ব্যাঙ্ক খাতায় সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে নির্ভুল ভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে। জনধন, আধার, মোবাইল- এর সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সরাসরি অর্থ প্রদানের ফলে সরকারি ভর্তুকির টাকা নয়ছয় হতে পারছে না এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০ লক্ষ ডিবিটি ট্রান্সফার হচ্ছে ভারতে।

● **৫. ইনসলভেন্সি এন্ড ব্যাঙ্করাফি কোড** বা আইবিসি হল মোদি সরকারের আরেকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ২০১৬ সালে এই আইন আসার আগে দেউলিয়া সংস্থাগুলো লিকুইডেট করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ছিল। অর্ধেক কেস সমাধান হতে প্রায় দশ বছর এবং ১৫% কেস সমাধান হতে প্রায় ২৫ বছর লেগে যেত। আইবিসি আইনের ফলে ব্যাঙ্ক এখন আগের তুলনায় সহজে এবং দক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনাদায়ী ঋণের টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

● **৬. নয় বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি** যখন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' পরিকল্পনার সূচনা করেন তখন অনেকেই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিলেন। আজ অ্যাপেলের মত বহুজাতিক সংস্থা যখন ভারতে তাদের উৎপাদন শুরু করতে চলেছে তখন বোঝা যাচ্ছে মোদিজির এই পরিকল্পনা কতটা সময়োচিত ছিল। আজ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক স্তরে চিনের বিপক্ষে যে মনোভাব তৈরী হয়েছে সেই পটভূমিতে চিন থেকে যে সব সংস্থা নিজেদের ব্যবসা অন্যত্র সরাসরি তাদের প্রথম গন্তব্য হতে চলেছে ভারত। সম্প্রতি এক ডজনর বেশী উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস ও সেমিকন্ডাক্টার প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইম্পেন্টিভ স্কিমের ফলে মেক ইন ইন্ডিয়া পরিকল্পনা নতুন গতি পেয়েছে।

● **৭. জাতীয় লজিস্টিক নীতি** যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে সেটা এই

সরকারের একটা বড় কৃতিত্ব। বস্তুত উৎপাদিত পণ্যকে বেশ কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও নির্দিষ্ট স্থানে সরবরাহ করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া লজিস্টিকের মধ্যে পড়ে। লজিস্টিকে ভারতে ব্যয় হয় জিডিপি'র ১৩ শতাংশ যেখানে উন্নত দেশে এই ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র মাত্র ৮ শতাংশ। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় রপ্তানিকারী সংস্থাগুলির লড়াই কঠিন হয়ে থাকে। নতুন এই লজিস্টিক নীতিতে এখন সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণকারী মন্ত্রক যেমন রেল, সড়ক, বন্দর, ইম্পাত, ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে নীতি নির্ধারণ করবে। লজিস্টিক পারফরম্যান্স ইন্ডেক্সে ভারত ২০১৮ সালে ৪৪ তম স্থান থেকে ছয় ধাপ এগিয়ে ২০২৩ সালে ৩৮ তম স্থানে আছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভারতের লজিস্টিক ব্যয় বিশ্বমানের করার এবং প্রথম ২৫ টি দেশের মধ্যে থাকার একটা লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ১০.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের ভারতমালা প্রজেক্টে দেশের মধ্যে ৮৩,৬৭৭ কিমি নির্মাণ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে একথা বলাই যায় যে ২০১৪ সালের আগে যে ভারত দুর্নীতি আর নীতিহীনতায় জর্জরিত হয়ে কোনক্রমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিল সেই ভারত আজ ৩.৭৫ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি'র সঙ্গে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে একই সারিতে বসার স্বপ্ন দেখছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি

এত কিছু ভালোর মধ্যেই যন্ত্রণাদায়ক যে জায়গাটার উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হল এই যে এই উন্নয়নের মহাযজ্ঞে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ শরিক হওয়া দূরের কথা, বরং উল্টো পথে হেঁটে চলাকেই শ্রেয় মনে করেছে কেন্দ্রের পাঠানো টাকার নয়ছয়, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, তোলাবাজির সমান্তরাল অর্থনীতি আজ বাংলাকে হতদরিদ্র করেছে। বাংলার জিএসডিপি'র বৃদ্ধির হার যেখানে নাকি ভারতের জিডিপি'র বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশী সেখানে বাংলার মানুষের মাথা পিছু আয় সারা ভারতের গড় আয়ের তুলনায় শুধু কমই নয়, একমাত্র উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্যের থেকে বেশী। গুজরাতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে যেখানে গুজরাতের জনসংখ্যা ভারতের মাত্র ৪.৯ শতাংশ সেখানে গুজরাতের অবদান ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৭.৯ শতাংশ। আর সেখানেই ভারতের জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ যে বাংলায় বাস করে তার অবদান ভারতের অর্থনীতিতে মাত্র ৫.৭ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সালের আরবিআই-এর তথ্য অনুযায়ী গুজরাতের মাথা পিছু আয় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিগুণ। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী ঋণের দিক থেকেও বাংলার ঋণের পরিমাণ (জিএসডিপি'র ৩৪.৮%) গুজরাতের (১৬%) দ্বিগুণ। এবং এই ফারাক ক্রমশই বাড়ছে।

একই অবস্থা রাজস্ব ঘাটতির দিক থেকেও। এত কিছু পরেও বাংলার নেতাদের মুখে শোনা যায় যে, “বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না!”। ওনারা ভুল বলেন না। সত্যই বাংলা যে পথে হেঁটেছে তাতে গুজরাতের যে ধারে কাছেও আসতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনের আগে গুজরাতের সাফল্য দেখে মানুষ শ্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল। আজ বাংলার সিংহাসনে বসে যিনি দিল্লীর মসনদ দখলের স্বপ্ন দেখছেন তিনি একবার ভেবে দেখেছেন কি দেশের সাধারণ মানুষ কোন দুঃখে বাকি ভারতের অবস্থা বাংলার মত হতে দেবে!



‘অমৃত ভারত স্টেশন’ প্রকল্পে ভোল বদলে যাচ্ছে দেশের ৫০৮টি রেলস্টেশনের। দীর্ঘ ৪৮ বছর অপেক্ষার পর প্রথম রেলওয়ে স্টেশন পেতে চলেছে সিকিম। এই তালিকায় রয়েছে রাজ্যের ১২টি জেলার মোট ৩৭টি স্টেশন। প্রকল্পের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা।



‘অমৃত ভারত স্টেশন’। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং মেচেরা স্টেশনের চিত্র। জোর ধাক্কা তৃণমূলের বঞ্চনা তত্ত্বের প্রচারে।



মমতা-অভিষেকের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে রাজ্যে ৪৬টি রোড ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস, জাতির প্রতি উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দেশের ৯ প্রজেক্টে ১২,৮০০ কোটি বিনিয়োগ করছে জাপান।



যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভুল থেকে শিক্ষা

সুভাষ বিশ্বাস

যোগেন্দ্রনাথ স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের উপর ভরসা না রেখে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন পাকিস্তানকে ঘিরে যা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল। তাঁর এই ভুলের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নমঃশূদ্ররা। যোগেন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের জন্য নমঃশূদ্র তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁকে বিশ্বাসঘাতকের আসনে বসিয়েছেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নমঃশূদ্রদের বেশিরভাগ অংশই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগ তথা বাংলা ভাগের ফলে সেসব জেলার অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে দেশভাগের পরবর্তী বছরগুলিতে বিপুল সংখ্যক নমঃশূদ্র তাদের পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। নমঃশূদ্রদের অন্যতম নেতা তথা পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমদিকে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও দেশভাগের ৩/৪ বছরের মধ্যেই সেখান থেকে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের চল নামে পশ্চিমবঙ্গে।

নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের ব্যাপক সংখ্যায় আগমন স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রকে পালটে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের উপর ভরসা না রেখে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন পাকিস্তানকে ঘিরে যা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল। তাঁর এই ভুলের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নমঃশূদ্ররা। নমঃশূদ্ররা হিন্দু দলিত হলেও তিনি নমঃশূদ্রদের মেলাতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের সঙ্গে। তিনি আশা করেছিলেন যে, মুসলিমদের জন্য পৃথক পাকিস্তান তৈরি হলে দলিত নমঃশূদ্ররা সেখানে যুক্তিসঙ্গত অধিকার পাবেন। তাই পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর তিনি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে বোঝান যে, দেশ ছেড়ে তাদের ভারতে যেতে হবে না। কারণ, পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের সঙ্গে সহাবস্থান করেই তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে এবং নিজেদের যুক্তিসঙ্গত অধিকার পাবেন। কিন্তু দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্ররা তা মোটেই পায়নি। বরং পাকিস্তানে তারা বারংবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছে। কেননা পাকিস্তান নমঃশূদ্রদের

হিন্দু হিসাবেই দেখেছে। আর স্বাধীনতার মুহূর্তে যোগেন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে পৃথক পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন, পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মতদান, নিজে উচ্চ মন্ত্রীপদে আসীন হয়ে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া, অনুগামী নমঃশূদ্রদের দেশত্যাগে নিরাস করা প্রভৃতি পদক্ষেপগুলি যে তাঁর কত বড় ভুল ছিল তা বছর দুয়েকের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যায়। এসব কাজের ফলে তাঁকে একেবারে একা হয়ে যেতে হয়। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতে পালিয়ে এসে পাক প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর যে সুদীর্ঘ পদত্যাগপত্র পাঠান, তার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্রদের উপর সাম্প্রদায়িক বর্বরতার নানা তথ্য। পাকিস্তান কেন হিন্দুদের পক্ষে বসবাসের উপযোগী নয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথ তাঁর পদত্যাগ পত্রে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর উপর সেখানকার শাসক এবং সংখ্যাগুরু মুসলিমদের দাঙ্গা ও নির্যাতনের নানা ঘটনা তুলে ধরেন।

যোগেন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর ভুলের জন্য পরবর্তীকালে অনুতপ্ত ছিলেন। ফলে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, নমঃশূদ্রদের ফেলে রেখে গোপনে কলকাতায় পালিয়ে এসে ৮ অক্টোবর পাক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে পাঠিয়ে দেন। জানিয়ে দেন যে, হিন্দুদের পক্ষে পাকিস্তানে বসবাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতদিন দেশত্যাগ করে ভারতে এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বের উপর ভরসা করে বিপুল সংখ্যক নমঃশূদ্র পূর্ববঙ্গেই রয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে সেখানে দাঙ্গা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে তাঁরা পড়লেন বিপদে। ফলে যোগেন্দ্রনাথের দেশত্যাগের পর পূর্ববঙ্গের দলিত হিন্দুদের ধাপে ধাপে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গে যখনই সংখ্যাগুরুর উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে তখনই তাঁরা



যোগেন্দ্রনাথ মঙ্গল

ছোট কয়েকটা পুটলিতে সামান্য সম্বলটুকু নিয়ে শ্রোতের মতো বাংলায় আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৪, ১৯৭১ প্রভৃতি বছরগুলিতে দাঙ্গার কারণে দলিত উদ্বাস্তু শ্রোত বেড়েছে, তবে মধ্যবর্তী বছরগুলিতে এই শ্রোত কখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। এমনকি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পরও দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করে শরণার্থী (Refugee) হিসেবে বসবাস করেছে। দেরিতে ভারতে এসে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নানাভাবে তার ফল ভুগতে হয়েছে। দেশভাগের পরপর পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দুরা যেমন দ্রুত ভারতে চলে এসে এদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, নমঃশূদ্ররা তা পায়নি। কারণ, অধিকাংশ নমঃশূদ্র পরিবারকে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে নিজেদের স্বাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে নিঃস্ব, রিক্ত উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছেন।

দেৱীতে এপারে আসায় নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা আর সেভাবে সরকারি উদ্বাস্তু ত্রাণ বা পুনর্বাসনের সুযোগ পায়নি। পূর্ববঙ্গের একবন্ধ নমঃশূদ্র সমাজ ছেড়ে এসে তাদেরকে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, দণ্ডুকারণ্য, আন্দামান প্রভৃতি নানা প্রান্তে। দেশভাগের পূর্বে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক ও শিক্ষা

আন্দোলনের প্রভাব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ মঙ্গল-সহ বিভিন্ন নেতাদের আশ্রয় সরকারিভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে পিছিয়ে পড়া নমঃশূদ্ররা কিছুটা উন্নতি ঘটায়। কিন্তু দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিয়ে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র পরিবারগুলির আবার উনবিংশ শতকের আগে ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়। কেননা, নমঃশূদ্ররা পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর তপশিলী জাতি হিসেবে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে তারা তপশিলী জাতি হিসেবে বিবেচিত হয় না। উনবিংশ শতকের দরিদ্র, অনগ্রসর উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের পক্ষে সাধারণ জনজাতির সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের উন্নতি ঘটানো অসম্ভব। দণ্ডুকারণ্যের মতো রক্ষ, উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ী অঞ্চলে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে মরিচবাঁপির মতো কুখ্যাত গণহত্যার ঘটনার শিকারও হয়েছে নমঃশূদ্ররাই। নাগরিকত্বের অধিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকেই সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয়েছে। বিগত প্রায় এক দশক আগে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের নাগরিকদের জন্য আধার কার্ড চালু করলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ লাখ নমঃশূদ্র-মতুয়া আবার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ, তাদের অধিকাংশই ভারতের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। যদিও সেই ভয় ছিল অহেতুক এবং বাম-তৃণমূলের তৈরি করা।

দেশভাগের পূর্বে কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তু আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে কখনও সেই কংগ্রেস, কখনও হিন্দু মহাসভা, কখনও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হয়েছে। কুপার্স ক্যাম্প, বাগজোলা, ঘুঘুড়ি, কইজোলার নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের অমানুষিক দুর্দশা লাঘবে লড়াই

করতে গিয়ে তাঁকে স্লোগান দিতে হয়েছে— 'আমরা কারা? বাস্তুহারা।' আসলে তিনি নমঃশূদ্রদের হিন্দু পরিচয়কে আড়াল করতে চাইছিলেন এবং যা অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিক ভুল ছিল। একদা আশ্বেদকরের 'সিডিউল্ড কাস্টস ফেডারেশন'-এর বাংলা প্রদেশের সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ ১৯৬৩ সালে আশ্বেদকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু এই দলের প্রার্থী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেও তাঁকে সমঝোতা করতে হয়েছে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কারণ, এপার বাংলায় মানে ভারতে বাস্তবতা ছিল আলাদা এবং অনেক নমঃশূদ্রও তাঁর উপর আর ভরসাও রাখতে পারেনি। অথচ কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থীরা ভোটে বিভিন্ন আসনে নমঃশূদ্র ভোটে ফায়দা তুলেছে। কারণ, বিভিন্ন কেন্দ্রে যোগেন্দ্রনাথের প্রভাবে নমঃশূদ্র ভোটের একাংশ কমিউনিস্টদের পক্ষে গিয়েছিল। ১৯৫০-এ যোগেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে এখানকার নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু ও দলিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এবং অন্যদিকে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের ভোটের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। ততদিনে হিন্দু-মুসলিম সবার কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। 'আমরা হিন্দু মুসলমান কোনওটাই নই'— নমঃশূদ্র-মতুয়া উদ্বাস্তুদের নিয়ে

এই ধরনের স্লোগান আর এপারে তুলতে পারছেন না। আর অন্যান্য উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতারা অনেকেই তাঁকে 'বিভেদ সৃষ্টিকারী বিপজ্জনক লোক' হিসেবে দেখেছেন। রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের মতো অসংখ্য অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে উদ্বাস্তুরা ছিল দলিত, মূলত নমঃশূদ্র। তাদের অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভদ্রলোকদের উদ্বাস্তু আন্দোলন এসব দলিত উদ্বাস্তুদের স্বার্থ দেখবে না— এই ভেবে যোগেন্দ্রনাথ একটি নতুন উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তুললেন। নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ১৯৫৮ সাল থেকে যোগেন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু সেসব কিছুকাল পর ব্যর্থ হয়েছে।

দেশভাগের আগে-পরে পূর্ব পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের জন্য নমঃশূদ্র তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁকে বিশ্বাসঘাতকের আসনে বসিয়েছেন। তাই ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাঁসখালি, বারাসাত-সহ বিভিন্ন নমঃশূদ্র-অধ্যুষিত কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়লেও নমঃশূদ্র ভোটাররা তাঁর উপর আর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেননি। আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে, “১৯৫২ সাল থেকে পর পর সব সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, '৬৪-তে একটা উপনির্বাচনও লড়েছেন। সব কাটাতেই হেরেছেন। '৬৭-তেও হারবেন প্রায় জানা ছিল সে কথা। বামপন্থীদের সমর্থন থাকায় একটা ক্ষীণ আশা ছিল; কিন্তু দেখা গেল ফলাফলে যোগেন্দ্রনাথ তিন নম্বরে আছেন। ওঁর এবং ওঁর সহকর্মীদের মনে হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতার এ আর এক অধ্যায়া উচ্চবর্ণের লোকেরা ওঁকে ভোট দেয়নি, দিয়েছে শুধু নমঃশূদ্র জনতা। অথচ ওঁর প্রচারের ফলে বাম প্রার্থীরা নমঃশূদ্রের ভোট পেয়েছেন। কিন্তু নমঃশূদ্ররাও সবাই যে ওঁকে সমর্থন করে এসেছে এমন নয়, সাম্প্রতিক ইতিহাসবিদরা অন্তত সেটাই বলছেন। ওঁকেই যখন বারবার বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তখন এমনটাই যে হবে তাতে আর আশ্চর্যকী!”

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারতে এসে বাঙালি উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের বিরোধিতা করেন। ড. মেঘনাদ সাহার জমি জরিপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। উদ্বাস্তুদের অধিকারের দাবিতে এই ক্যাম্প থেকে ওই ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে তিনি উদ্বাস্তুদের সচেতন ও সংঘটিত করতে থাকেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি দুবার কারাবরণ করেন। দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র নেতা তথা মতুয়া ধর্মগুরু পি. আর. ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ঘরে-বাইরে যোগেন্দ্রনাথ আরও একা হয়ে পড়েন। যোগেন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেন নমঃশূদ্র নেতা মণীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস এবং অপূর্বলাল মজুমদারও।

এমন এক পরিস্থিতিতে ১৯৫৭ সালের বিধান পরিষদের নির্বাচনে বনগাঁ সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হন। মনোনয়ন পান যোগেন্দ্রনাথেরই অনুগত মণীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস। ফলে যোগেন্দ্রনাথ সেই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ান এবং যথারীতি মণীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হন। এরপর ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নদীয়া জেলার হাঁসখালি লোকসভা কেন্দ্র এবং ২৪

পরগণা জেলার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান। তাঁকে হারাতে যাবতীয় কৌশল তৈরি করে কংগ্রেস। এই নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে হাঁসখালিতে পি. আর. ঠাকুরকে এবং বাগদায় মণীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাসকে কংগ্রেস প্রার্থীপদে মনোনয়ন দেয়। বিপুল শক্তি নিয়ে কংগ্রেস যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে দুটি কেন্দ্রেই হারিয়ে দেয়। এরপর আবার ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে বারাসাত কেন্দ্র থেকে আর.সি.পি.আই. ও বাম-কমিউনিস্ট সমর্থিত মোর্চার প্রার্থী হলেন। এই লোকসভার অধীন সাতটি বিধানসভার ভোটের নিরিখে মোর্চার প্রার্থী হিসেবে তাঁর অন্তত দেড় লক্ষের কাছাকাছি ভোটে জেতার কথা। কারণ সাতটির মধ্যে পাঁচটিতেই তখন মোর্চার বিধায়করা জয়ী ছিল। কিন্তু বাস্তবে তিনি রনেন্দ্রনাথ সেনের কাছে প্রায় ৭৭ হাজার ভোটে পরাজিত হন। যোগেন্দ্রনাথের পরাজয় সম্পর্কে প্রদীপ কুমার বিশ্বাস দাবী করেছেন যে, এই পরাজয়ের মূল ষড়যন্ত্রী নাকি ছিলেন মেকি কমিউনিস্ট ধ্বজাধারী প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, শান্তিময় ঘোষ প্রমুখ নেতারা। নমঃশূদ্রদের সামনে রেখে কখনও এদল কখনও সেদল করেও যোগেন্দ্রনাথ কখনই নির্বাচনে জিততে পারেননি। হয়ত ভারতের নমঃশূদ্ররাই তাঁর পাশে ছিলেন। পাকিস্তানে থাকাকালীন তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা কখনই তিনি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী নদীয়া, ২৪ পরগণা-সহ কয়েকটি জেলার বিভিন্ন লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্র নমঃশূদ্র-মতুয়া অধ্যুষিত। তখন ভারতের মতুয়া মহাসংঘের প্রধান পি. আর. ঠাকুর নিজে কোনো আসনে লড়াই করে মতুয়া ধর্মগুরু হিসেবে অন্য আসনগুলিতে যোগেন্দ্রনাথ-সহ অন্যান্য নমঃশূদ্র নেতাদের নৈতিক সমর্থন দিলে পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র-মতুয়ারা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের ভাবনার ভুলের জন্য কেউই তাঁর পাশে এগিয়ে আসেনি।

১৯৩৭ সালে বাখরগঞ্জ অসংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে লড়াই করে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে সেখানকার হিন্দু তপশিলী ও মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে যোগেন্দ্রনাথের জয়লাভ সুনিশ্চিত করেছিল। হয়তো হিন্দু দলিত-মুসলিমের এই ভোট-রাজনীতির ধারাটাই যোগেন্দ্রনাথের মনে গেঁথে দিয়েছিল যে, হিন্দু দলিত-মুসলিম একত্রিত হলে নির্বাচনে জয়লাভ সুনিশ্চিত। হয়তো সেজন্যই তিনি দেশভাগের লগ্নে দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রচার করে পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক পথ মানুষ গ্রহণ করেনি। তাই তাঁর নিজ সম্প্রদায়েরই বড়ো অংশের মানুষ হাঁসখালি, বাগদা, বারাসাত প্রভৃতি কেন্দ্রের ভোটে তাঁকে নিরাশ করেছে, অ-তপশিলী ভোটারদের ভোটলাভে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে বাখরগঞ্জের মতো ব্যাপক মুসলিম ভোটার ছিল না। কিন্তু অন্যদিকে বিচক্ষণ পি. আর. ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে এসে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে যথেষ্ট সাফল্য পান। আর রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত যোগেন্দ্রনাথ তখন বার্ষিক্যে দুর্বল। ১৯৩০-৪০-এর দশকের মতো লড়াই করার প্রাণবন্ত শক্তিও তখন তাঁর মধ্যে নেই। যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ কখনও স্বীকার করেননি যে ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাঁর ভাবনায় ভুল ছিল।



ত্রিবেণী কুম্ভ

সাধুসঙ্গে ভারত মাতার জয়গান

পল্লব মন্ডল ও জাতিস্মান সরকার

সাধারণ কুম্ভমেলা হয় প্রতি চার বছর অন্তরা অর্ধকুম্ভ হয় প্রতি ছয় বছর অন্তরা। পূর্ণকুম্ভ হয় প্রতি বারো বছর অন্তরা। কিন্তু বাংলাতেও একসময় যে কুম্ভমেলা ছিল সে কথা ভুলে গেছে বিগত অনেকগুলি প্রজন্ম। ৭০৩ বছর অপেক্ষার পর সাধুসন্তদের প্রচেষ্টায় ২০২২ সালে পুনরুদ্ধার হলো বাংলার কুম্ভমেলা। ত্রিবেণী কুম্ভমেলা।

তীর্থ শব্দটার আভিধানিক অর্থ পায়ে হেঁটে গমন। তবে তীর্থস্থান বলতে ধর্মীয়ভাবে পবিত্র স্থান বুঝায় যে স্থানে দেবতা বা ঐশ্বর পূজা/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে স্থানে গমন করলে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগরের সমসাময়িক আর এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হলো সুম্ভক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীধাম। গঙ্গাতীরে, ২২°৫৮' ১০' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° ২৬' ৪০' পূর্ব দ্রাঘিমায়ে অবস্থিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বলিয়াছেন:-

“বাম দিকে হালি সহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
বাত্রিদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেমতিল খেনু দ্বিজে দেয় দান।
গর্ভে বসি শিব পূজা করে কোন
জন রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জনের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে।”

কবিকঙ্কণ এই ত্রিবেণীকে “তীর্থের চূড়ামণি” বলিয়াছেন। ত্রিবেণী স্নানের অর্থ নিদ্রিতা শক্তি কুন্ডলিনীর জাগরণ। ত্রিবেণীস্নানের মূলাধার পক্ষে হয়, যেখানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুমুমা এই তিনটি নাড়ি একসাথে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীধাম হলো এই তথ্যের মূলাধার। ত্রিবেণী স্নানের অর্থ নিদ্রিতা শক্তি কুন্ডলিনীর জাগরণ। তাই ত্রিবেণীতে স্নান করলে সাধকের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং স্নানার্থী অপার্থিব শান্তিলাভ করে। সাধকরঞ্জন উল্লিখিত ত্রিপদী ছন্দের একটি কাব্য থেকে পাওয়া যায়—

“ইড়া বাসস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ি সুমুমা ॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয় ॥”

বিশ্বের দরবারে ভারতের কুম্ভমেলা কয়েক বছর আগেই স্বীকৃতি

পেয়েছে। কুম্ভমেলাকে বিশ্বের বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পুণ্য লাভের জন্য এক শ্রেণীর মানুষ কুম্ভ স্নানকে আবশ্যিক বলে গণ্য করেন। ২০১৭ সালে UNESCO (ইউনেস্কো) (ইউনেস্কো) এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন) কুম্ভমেলাকে ভারতের অনবদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) বলে ঘোষণা করেছে। কুম্ভমেলার বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ রয়েছে। সাধারণ কুম্ভমেলা হয় প্রতি চার বছর অন্তর। অর্ধকুম্ভ হয় প্রতি ছয় বছর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগে (এলাহাবাদে)। পূর্ণকুম্ভ হয় প্রতি বারো বছর অন্তর। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে চারটি নির্ধারিত স্থানে (প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক) পূর্ণকুম্ভ হয়। বৃহস্পতি ও সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে কুম্ভমেলার স্থান নির্বাচন হয়।

বাংলাতেও একসময় কুম্ভমেলা ছিল সে কথা ভুলে গেছে বিগত অনেকগুলি প্রজন্ম। ৭০৩ বছর অপেক্ষার পর সাধুসন্তদের প্রচেষ্টায় ২০২২ সালে পুনরুদ্ধার হলো বাংলার কুম্ভমেলা। পাল ও সেন যুগের পরবর্তী সময়ে বাংলায় ইসলামিক শাসকদের অনুপ্রবেশ এবং অত্যাচারের ফলে বাংলার ইতিহাস থেকে মুছে যায় কুম্ভের নাম। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে আনুমানিক ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কুম্ভ মেলা। বেহলা-লক্ষ্মিন্দর খ্যাত হুগলি জেলার ত্রিবেণী, ভারতের তীর্থস্থানের মানচিত্রে এক অন্যতম স্থান। প্রাচীনকালে তিন নদীর সঙ্গমস্থল তথা সপ্ত ঋষির তপস্যা কেন্দ্র এই ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামে পরিচিত। স্থানীয় ইতিহাসবিদ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “ত্রিবেণী কুম্ভ মেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার একটা যোগ ছিল। তৎকালীন সাধুসন্তরা, গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর পদব্রজে ত্রিবেণীতে আসতেন। মাঘ সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষ্ণু সংক্রান্তির দিন তারা স্নান করতেন। এই দিনটাকেই অনুকুম্ভ হিসেবে ধরা হত ত্রিবেণীতে।”

১২৯২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সালতানাত এর সিপাহসালার বাহরাম আইতিগিন জাফর খান গাজী ত্রিবেণী আক্রমণ করে। জাফর খানের নির্দেশে তুর্কি সেনা ত্রিবেণীতে প্রচুর গণহত্যা চালায়, হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেয় ও ত্রিবেণীর পালযুগে নির্মিত একটি বিষ্ণু মন্দির ভেঙে দেয়। পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণীধামে জাফর খান হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে এবং কুম্ভমেলা বন্ধ করে দেয়। এমন সময় বর্ধমানভুক্তির মহারাজা ভূদেব রায় ত্রিবেণী পুনরুদ্ধার ও হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন রাজা ভূদেব রায়ের নেতৃত্ব বর্ধমানের ভেদিয়ার সৈন্যবাহিনী



ত্রিবেণী আক্রমণ করে। ইটাচুনার কাছে মহানাদের প্রান্তরে রাজা ভূদেব রায় আর জাফর খান গাজীর সাক্ষাৎ হয়। মহানাদের প্রান্তরে বর্ধমান সেনার সাথে দিল্লি সালতানাত এর সেনার প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে মহারাজা ভূদেব রায় দিল্লির সেনাকে পরাস্ত করেন ও জাফর খান গাজীর মুগ্ধেদ করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন। বর্ধমানের হিন্দু সেনা ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয় করে, ত্রিবেণীধামে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হয় এবং পুনরায় কুম্ভমেলা শুরু হয়। এখন কিছু ইতিহাসবিদ জাফর খাঁ গাজি ত্রিবেণী কুম্ভমেলা বন্ধ করেন এই মত প্রচার করেন। কিন্তু এই তত্ত্ব আদৌ সঠিক নয়। ১৫০৫ সালে পাণ্ডুর (মালদা) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য এই অঞ্চল দখল করে। তিনি সপ্তগ্রাম থেকে ত্রিবেণী যাওয়ার জন্য সেতু নির্মাণের আদেশ দেন এবং এই অঞ্চলে কাফের হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে সপ্তগ্রামের নাম “হুসেনবাদ” রাখা হয়। তিনিই ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। উড়িষ্যা আক্রমণ করে তিনি বহু মন্দির ধ্বংস করেন।

অবশেষে বহুকাল পর ২০২২ সালে সুদূর আমেরিকার বস্টনের অধিবাসী প্রবাসী বাঙালি ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জী এবং হাওড়া শিবপুরের ব্যবসায়ী শ্রী সাধন মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব পশ্চিম সাধু-সন্তদের পথনির্দেশনে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কুম্ভমেলা ও পুণ্য কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হয়েছিল ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তি ভৈষী-একাদশী তিথিতে। ২০২৩ এর ২৬ ফেব্রুয়ারী ৯৮তম 'মান কী বাত' অনুষ্ঠানে বঙ্গতীর্থ ত্রিবেণী নিয়েই মনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন "আপনারা কেবলমাত্র একটি প্রথাকে জীবিত করে তুলছেন তা না; বরং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষাও করছেন।" প্রশাসনিক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এবছরেও মহা ধুমধামে হয়েছে ত্রিবেণীর কুম্ভ স্নান।

অনেকেই কুম্ভ মেলাকে কেবল একটি ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে দেখতে পারেন, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এটি মানবতার উৎসবে বিবর্তিত হয়েছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হয় যেখানে নাস্তিক এবং আস্তিক উভয়ের ঐহিক আনন্দ ত্যাগের প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ভবানন্দকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আমরা অন্য মা মানি না, জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এই সনাতন হিন্দুধর্মই পেয়েছে দেশকে শুধু একটি জড় পদার্থ নয়, বরং মা হিসাবে দেখতে তাই দেশ মায়ের এই সাধু-সন্তদের হাত ধরেই বিশ্বের মাঝে ধ্বনিত হবে ভারত মাতার জয়গান।



ফেক নিউজ

আধার কার্ড নিয়ে মিথ্যা প্রচার

শোনা যাচ্ছে আধার কার্ড বাতিল সংক্রান্ত চিঠি আসছে কারুর কারুর কাছে সে চিঠি ফেক হতে পারে বা তার পিছনে অন্য কোন বিষয় থাকতে পারে। ঘটনা হল যাদের কাছে এই চিঠিগুলি এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে তারা নিজেরাও কেউ দাবি করেনি যে তাদের আধার কার্ড কাজ করছে না।



আসল খবর

আধার কার্ড নিয়ে বাঙালিকে বিভ্রান্ত করছে বাম তৃণমূল এবং কংগ্রেস। ভারতের কোন নাগরিকের আধার কার্ড বাতিল হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না।



কারুর আধার কার্ড বাতিল হলে সাথে সাথে তাঁর আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নাম্বার বন্ধ হয়ে যেতে রেশন পেতে না এবং তাঁর

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে। আধার কার্ড বাতিলের তথ্য একশো শতাংশ ফেক।

রাহুল 'ফেক' গান্ধী

খুব সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের আমেঠিতে রাহুল গান্ধী দাবি করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু আদিবাসী, তাই তাকে রাম মন্দিরের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।



আসল খবর

ঘটনা হলো রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সম্পর্ক প্রমুখ শ্রী রাম লাল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্য অধ্যক্ষ শ্রী অলোক কুমার এবং রাম মন্দির নির্মাণ সমিতির অধ্যক্ষ শ্রী নৃপেণ মিশ্র একসাথে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মুকো।



কংগ্রেসের 'ফেক' ডাভিডিয়া

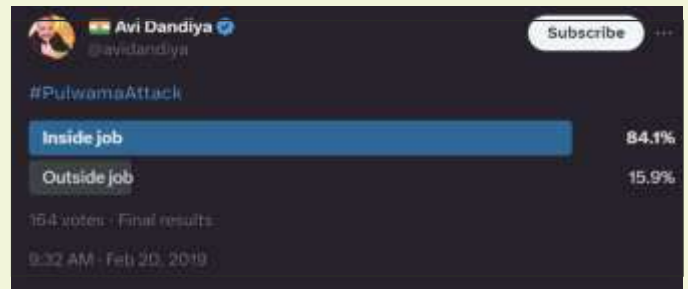
বিদেশ থেকে মিথ্যে খবর ছড়ানো অভি ডাভিয়াকে সোশ্যাল মিডিয়া প্রধানের দায়িত্ব দেয় কংগ্রেস। অভি ডাভিয়াকে কিরকম ভাবে মিথ্যা খবর ছড়ায় তা একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। (অ)ভদ্রলোকের দাবি অনুযায়ী তার করা টুইটার পোলে মোট ভোট পড়েছে ১৬৪টি। তার মধ্যে ৮৪.১% নাকি দাবি করেছে এটা অভ্যন্তরীণ ঘটনা



অর্থাৎ এতে পাকিস্তানের হাত নেই।

আসল খবর

১০০ শতাংশ মিথ্যা খবর। যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় গর্জে উঠেছিল পুলওয়ামাতে জঙ্গি আক্রমণের বিরুদ্ধে সেখানে



সম্পূর্ণ মনগড়া এক ফল দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা কংগ্রেসের মত দলের পক্ষেই সম্ভব।

কেজরিব ভুল স্বীকার

২০১৮ সালে বিজেপি আইটি সেল সম্পর্কিত ইউটিউবার ধ্রুব রাঠির ভিডিও রিটুইট করেছিলেন আম আদমি পাটির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ফৌজদারি মানহানির মামলা হয় দিল্লি হাইকোর্টে। সমন জারি হয়। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান অরবিন্দ কেজরিওয়াল।



আসল খবর

বিজেপি আইটি সেল নিয়ে ধ্রুব রাঠির ভিডিও ১০০ ভাগ মিথ্যা ছিল। প্রমাণ হতে রীতিমতো হলফনামা দিয়ে কেজরিওয়াল সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন যে জার্মানি থেকে চালানো ফেক নিউজের ফ্যান্টাস্টিক কর্ণার ধ্রুব রাঠির করা ফেক টুইট শেয়ার করে তিনি ভুল করেছেন।



পাকিস্তানি 'ফেক' টুইট

পাকিস্তানের এক টুইটার একাউন্ট দাবি করে তিনজন ভারতীয় নাকি ইজরাইলি মহিলা সেনাকে ধর্ষণ করেছে সেখানে 'আক্রান্ত' মহিলার ছবিও দেওয়া হয়। বাডের বেগে ছড়িয়ে পড়ে সেই টুইট।

আসল খবর

পরে জানা যায় সেই ডাউনলোড করা ছবি এক পুরনো মডেলের এবং খবর সর্বৈব মিথ্যে।



নীতিন গড়করি নিয়ে মিথ্যা প্রচারে কংগ্রেসের গড়াগড়ি

দ্বিচারিতা এবং মিথ্যে বচনের অপরাধ নাম সম্ভবত কংগ্রেস। রাহুল 'ফেক ফ্যাক্টরি'-র প্রচার ছিল যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, 'কৃষকদের অবস্থা বেশ খারাপ'। কংগ্রেসের দাবী ছিল, বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেই সরকারের বিরুদ্ধে বলছে।

আসল খবর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা

বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গড়করি 'দ্য লাল-টপ' নামের এক নিউজ চ্যানেলে দীর্ঘ ইন্টারভিউতে জানান, "স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতের কৃষকদের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। না ছিল রাস্তা, না ছিল সেচ ব্যবস্থা। এই অবস্থা থেকে পরবর্তী দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের শাসনে কৃষকদের বিশেষ উন্নতি হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা তথা প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষকদের অবস্থা উন্নতির দিকে"। এই সমগ্র



বক্তব্য থেকে 'কৃষকদের অবস্থা বেশ খারাপ' এই অংশটুকু কেটে নিয়ে কংগ্রেস প্রচার করে থাকে যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেই সরকারের বিরুদ্ধে বলছে।

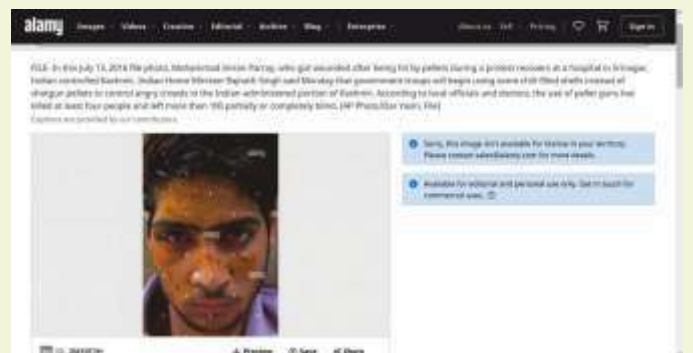
আর তাছাড়া আজ কংগ্রেস স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট (২০০৪) মেনে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনি বৈধতা দেবার কথা বড় মুখ করে বলছে। ঘটনা হলো স্বামীনাথন কমিশন এই রিপোর্ট দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তা খারিজ করে দেয়।

কৃষক আন্দোলনও ফেক নিউজ!

স্বঘোষিত কৃষকদের ফেক আন্দোলনের মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকা দেশবিরোধী লোকজনের দাবী, তথাকথিত কৃষক আন্দোলনে নাকি আহত হয়েছে এই যুবক।

আসল খবর

আসলে এই যুবকের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের কোন যোগাযোগ নেই। যুবকের বাড়িঘর পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় নয়। যুবকের বাড়ি কাশ্মীরে। ছবিটি তোলা হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৩ জুলাই। প্যালেট বুলেটে আক্রান্ত এই যুবক, মহম্মদ ইমরান শ্রীনগরের এক হাসপাতালে সুস্থ হয়ে ওঠে।



লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রথম প্রার্থী তালিকা



প্রার্থীর নাম	লোকসভা কেন্দ্র
নিশীথ প্রামাণিক	(কোচবিহার)
মনোজ টিগ্লা	(আলিপুরদুয়ার)
সুকান্ত মজুমদার	(বালুরঘাট)
খগেন মুর্মু	(মালদহ উত্তর)
শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী	(মালদহ দক্ষিণ)
নির্মল সাহা	(বহরমপুর)
গৌরীশঙ্কর ঘোষ	(মুর্শিদাবাদ)
জগন্নাথ সরকার	(রানাঘাট)
অশোক কাভারী	(জয়নগর)
শান্তনু ঠাকুর	(বনগাঁ)
অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়	(যাদবপুর)
রথীন চক্রবর্তী	(হাওড়া)
লকেট চট্টোপাধ্যায়	(হুগলী)
সৌমেন্দু অধিকারী	(কাঁথি)
জ্যোতির্ময় মাহাতো	(পুরুলিয়া)
হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়	(ঘাটাল)
সুভাষ সরকার	(বাঁকুড়া)
সৌমিত্র খাঁ	(বিষ্ণুপুর)
পিয়া সাহা	(বোলপুর)





নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত দুই দিনের বিজেপি জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জে পি নাড্ডা এবং শীর্ষস্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।



নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় পদাধিকারী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি, সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহজি সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

— 66 —

এইবার
8000
পার

— ” —



প্রধানমন্ত্রী **শ্রী নরেন্দ্র মোদী**